সত্যজিৎ রায়ের অজানা গল্প অমরত্বের মন্ত্র

সন্দেশ

সম্পাদক

সন্দীপ রায় • সুজয় সোম

এই সংখ্যায়

শৈলেন ঘোষ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শঙ্খ ঘোষ

নবনীতা দেব সেন

বুদ্ধদেব গুহ

পিয়ের গ্রিপারি

অনিতা অগ্নিহোত্রী

শোভন সোম

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সমীর সরকার

চণ্ডী লাহিড়ি

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

দেবব্রত ঘোষ

জুন ২০০৫। ১০ টাকা

Bengali Download

eBook Releaser Group Presents

Next Generation eBooks with No Watermark

We always encourage to buy original books

সবুর করো, তবে তো মেওয়া ফলবে!

সত্যজিৎ রায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস

অজানা উপন্যাস !

অবতার

চলবে টানা ২ বছর !

সন্দেশ

বাঙালির ছোটবেলা। চার পুরুষ ধরে।

১৩২০/১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত
ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

সন্দেশ

তৃতীয় পর্যায়। বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২
জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ জুন ২০০৫

বিশেষ রচনা

শঙ্খ ঘোষ অল্পবয়স কল্পবয়স ১৪
নবনীতা দেব সেন হিং টিং ছট ৩০
অলক চট্টোপাধ্যায় আরও অবাক হওয়ার অপেক্ষায়! ৫৪

ধারাবাহিক উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ ফোটা কার্তুজের গন্ধ ৪০
শৈলেন ঘোষ ঝুংরিটুং ৬০

ধারাবাহিক চিত্রনাট্য

সন্দীপ রায় বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ৬৬

গল্প

অনিতা অগ্নিহোত্রী নিশিকান্ত আর হাঁসেরা ২২
সত্যজিৎ রায় অমরত্বের মন্ত্র ৫০
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ছেঁড়াকাঁথার গল্প ৮০
পিয়ের গ্রিপারি • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য মুফতার রোডের ডাইনি ৮৯

ছড়া ও কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ফুলচোর ৬
রেবন্ত গোস্বামী মামার বাড়ি ১২
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমের দিন ২১
দীপ মুখোপাধ্যায় আয় ঘুম যায় ঘুম ৪৮
রত্নেশ্বর হাজরা শালিকবাড়ির খুকু ৯৬

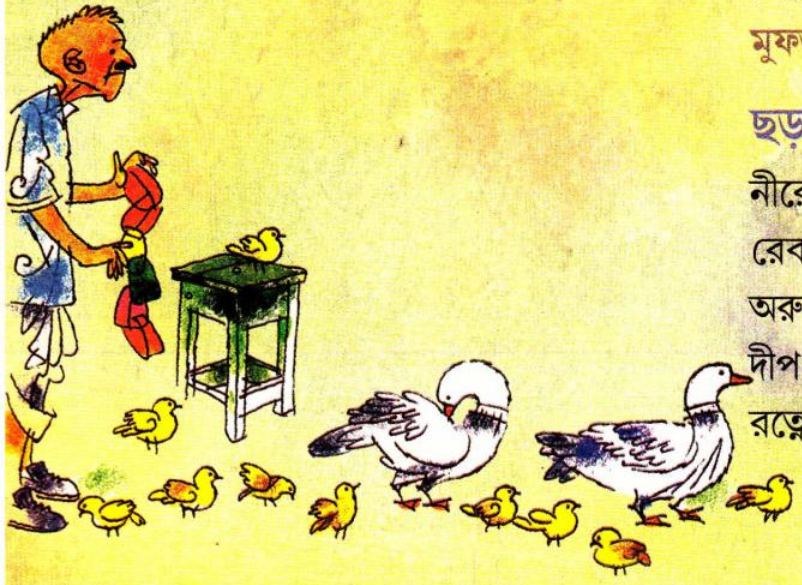

কার্টুন ও কমিক্স

অমল চক্রবর্তী ছবির মজা ৩৩
চণ্ডী লাহিড়ি লেখাপড়া কভু নয় ৭৮
ইন্দ্রনীল ঘোষ স্তব্ধ হৃদয় ৮৭

বিভাগীয় রচনা

চিঠিপত্র ৭
জীবন সর্দার প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর ১৮
শোভন সোম বই চেনো ৩৪
হাত পাকাবার আসর ৪৬
অরূপ ও বভ্রবী মণ্ডল
কম্পিউটার! কম্পিউটার! ৫৮
অনিরুদ্ধ দেব মনের কথা কই ৭৬
জয় মিত্র কেরিয়ার ক্যাম্প ৮০
সুশোভন মান্না নতুন নতুন আবিষ্কার ৮৬
রাজশ্রী রাহা রান্নাবান্না ৯৮

প্রচ্ছদপট

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ

সত্যজিৎ রায়
সমীর সরকার
চণ্ডী লাহিড়ি
নীতিশ মুখোপাধ্যায়
পুইগ রোসাদো
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত
দেবব্রত ঘোষ
অমল চক্রবর্তী
সমীর দাশ
দেবাশিস দেব
সৌমিত্র সোম

আলোকচিত্র

হীরক সেন

সম্পাদক সন্দীপ রায় • সুজয় সোম

সন্দেশ কার্যালয় ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড কলকাতা ৭০০০২০ থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড ৫২ রামমোহন রায় সরণি কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত
ফোন • সম্পাদকীয় ৯৪৩৩৩৬৭৩৯৩। সার্কুলেশন ৯৪৩৩১১২৬০৭। বিজ্ঞাপন ২৪৬৩৪৭০১
ফ্যাক্স (৯১) (০৩৩) ২২২৬২৭২৮
ই-মেল sandesh1913@yahoo.co.in

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ফুলচোর

ফুলগুলি চুরি করে নিয়ে যায় রোজ
যে-লোকটা, খোঁজ তাকে, ভালো করে খোঁজ
তোরা সব্বাই।
ফোটে কত জুঁই চাঁপা কামিনী টগর,
কত সৌরভ তারা ঢালে রাতভর,
কী বলব ভাই!

কিন্তু সকালে উঠে বুক করে খাঁ-খাঁ,
দেখি সব ফুলগাছ একেবারে ফাঁকা।
শেষরাতে এসে
অন্যের ফুল চুরি করা যার কাজ,
সব ফুল নিয়ে গেছে সেই ধড়িবাজ।
ভেবে মরি কে সে।

চোরেরা কি ছড়া পড়ে? যদি পড়ে, তবে
এই ছড়া পড়ে তার আক্কেল হবে,
ছড়া লিখি তাই।
আর যদি না-পড়ে তো কোনও এক ফাঁকে
ধরে ফেলে তোরা যেন দিয়ে দিস তাকে
বেদম ধোলাই।

অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

বৈশাখের নতুন 'সন্দেশ' নিঃশেষিত

'সন্দেশ'-এর এখন নতুন আপিস। নতুন কম্পিউটার, নতুন স্ক্যানার, নতুন প্রিন্টার, নতুন ফুর্তি। দুই সম্পাদকের একজন নতুন। পেশাদারি কর্মীরা প্রায় সবাই নতুন। নতুন উদ্যমে, নতুন স্বপ্নে, নতুন মেজাজে হৈহৈ করে দিন-রাত কাজ হচ্ছিল নতুন বছরের নতুন সংখ্যার। তারিমধ্যে নতুন উৎপাত! নতুন কম্পিউটার নতুন নতুন ঢঙ দেখাতে লাগল! থেকে থেকেই ভুল করে, ঢিলেমি দেয়, বিগড়োয়, থমকে যায়! ওদিকে সার্কুলেশন বিভাগের নতুন নতুন হুমকি আসে, মমার্থ একটাই : দেরি করে বেরোলে কিন্তু 'সন্দেশ' বিক্রি হবে না, ডাঁই হয়ে পড়ে থাকবে। তাই শুনে সম্পাদকীয় আর শিল্প-বিভাগের নতুন কর্মীরা, এমনকী নতুন সম্পাদকও মহা চটিতং : নতুন মেজাজের 'সন্দেশ' লোকে নেবেই। প্রিন্ট অর্ডার কত বাড়ানো যায়, তাই নিয়ে বরং নতুন নতুন প্ল্যান হোক।

তারপর? তারপর বৈশাখের 'সন্দেশ' বেরোতেই নতুন নতুন রোমাঞ্চ এসে হাজির! শুধু কলকাতা বা বঙ্গদেশ নয়, দিল্লি পাটনা মুম্বই ব্যাঙ্গালোর, এমনকী ঢাকা থেকেও—টেলিফোনে, এস এম এস-এ, ই-মেল-এ, চিঠিপত্রে—নতুন আহ্লাদ, নতুন অভিনন্দন, নতুন খুশি, নতুন হৈচৈ! কত-যে নতুন বন্ধু পাওয়া গেল! অতি সাধারণ পাঠক থেকে অতি প্রতিভাবান মানুষের নতুন নতুন পরামর্শ, সমালোচনা, প্রশ্রয় এবং শুভেচ্ছা। মহাশ্বেতা দেবী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সমীর সরকার, গৌতম ঘোষ, অনিতা অগ্নিহোত্রী, নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শোভন সোম, চণ্ডী লাহিড়ি, আবুল বাশার, শৈলেন ঘোষ, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন, জয় গোস্বামী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত ঘোষ, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, তিলোত্তমা মজুমদার—আরও অনেকেই—সবাই চাইছেন নতুন 'সন্দেশ' আরও নতুন নতুন সাধ আর স্বপ্ন নিয়ে, নতুন কল্পনা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে মাসে মাসে নতুন আলো ফেলুক নতুন পৃথিবীতে।

নতুন কথা আরও আছে। নতুন নতুন বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে থেকে থেকেই আমাদের নতুন নতুন মিটিং। ভারতের নানা প্রান্ত, এমনকী বিদেশেরও নতুন নতুন ম্যাগাজিন এজেন্ট-এর সঙ্গে আমরা তৈরি করতে চাইছি নতুন নতুন সাঁকো। মানি অর্ডার কিম্বা অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক-এ বার্ষিক চাঁদা পাঠিয়ে নতুন নতুন গ্রাহকের সংখ্যাটা রোজই বেড়ে যাচ্ছে লাফ দিয়ে। আরও একটা নতুন খবর—'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির গানের খাতায় হঠাৎই খুঁজে-পাওয়া যে অসাধারণ গল্পটা এবারে ছাপা হল—'অমরত্বের মন্ত্র'—সত্যজিৎ রায়ের কোনও বইতে এ-গল্পটা খুঁজে পাবে না।

নতুন 'সন্দেশ' বেরোবার ঠিক আটদিনের মাথায় টেলিফোনে শোনা গেল 'সন্দেশ'-এর সার্কুলেশন বিভাগের নতুন গলা : বৈশাখের 'সন্দেশ' নিঃশেষিত।

সন্দীপ রায়

নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়

বাঙালির ছোটবেলা, চার পুরুষ ধরে

কী চমৎকার বিজ্ঞাপনী-স্লোগান—'বাঙালির ছোটবেলা, চার পুরুষ ধরে'! সকালবেলা 'আজকাল' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় আচমকা 'সন্দেশ'-এর বিজ্ঞাপন দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ইশ্! কতদিন 'সন্দেশ' পড়ি না!

বোধহয় ১৯৮৪-৮৫, সত্যজিৎ রায় অসুস্থ হবার পর থেকেই 'সন্দেশ' একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। খুবই কষ্ট হত। কেননা ছোটবেলা থেকেই 'সন্দেশ'-এর একনিষ্ঠ গ্রাহক ছিলাম। তখন আমরা থাকি মির্জাপুর স্ট্রিটের ওদিকে, হিন্দু স্কুলে পড়তাম, প্রতি মাসে কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে 'নিউ স্ক্রিপ্ট'-এর দোকান থেকে 'সন্দেশ' আনতে গিয়ে ভারী মজা হত। ওখানে অনেক লেখক ও শিল্পীর সঙ্গে আড্ডাও মেরেছি! রাগে দুঃখে 'সন্দেশ' থেকে সরে গেসলাম। আমার ছোটবেলাটাকে অবহেলা—সহ্য করতে পারছিলাম না।

এবারে, ২০০৫-এর মে মাসে—এ যে পুরোদস্তুর পেশাদারি 'সন্দেশ', বাণিজ্য-সফলতার অনিবার্য হাতছানি! অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি 'সন্দেশ' নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। ১০ টাকায় ১০০ পৃষ্ঠার কাগজ—৩৬ পৃষ্ঠা রঙিন? সমীর সরকারের প্রচ্ছদপট ব্রিলিয়ান্ট। গোটা কাগজ-জুড়ে এমন কমপ্যাক্ট, ব্যালান্সড অথচ ক্রিয়েটিভ লেআউট—আজকের দিনে বাংলা-বাজারে দেখতে পাওয়া যায় কি? তেমনি আকর্ষণীয় সমস্ত ইলাসট্রেশন। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত আর দেবব্রত ঘোষকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম।

শৈলেন ঘোষের মতো ধ্রুপদী শিশুসাহিত্যিক ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছেন। আবুল বাশারের বড়গল্পটা এক আশ্চর্য উত্তর-আধুনিক রূপকথা। 'হিং টিং ছট'-এ নবনীতা দেব সেনের কী তীব্র মায়াজাল! আছেন চিরকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাদুকর লীলা মজুমদার। সুজয় সোমের 'গল্প-সল্প' এতই টানটান ও সোজা-সাপটা—আজকের বিচ্ছিরি পৃথিবীতে ছোটদের জন্য এমন মূল্যবোধসম্পন্ন, ব্যক্তিত্বময়, জোরালো লেখনির বড় দরকার। 'গল্প-সল্প'তে সাদা-কালোয় সমীর সরকার যে কোলাজটা এঁকেছেন, ওটা আধুনিক মানবসভ্যতার সম্পূর্ণ ইতিহাস!

প্রসূন চৌধুরী
৫০ অঞ্জনগড়। বিরাটি
কলকাতা ৭০০০৫১

'সন্দেশ'-এ লেখার আমন্ত্রণ! আমি অতিশয় আহ্লাদিত। এই বয়সেও মন নেচে উঠেছে। আমি 'সন্দেশ'-এর গ্রাহক ছিলাম। তখন ১৯৬৬-৬৭, সপ্তম অষ্টম শ্রেণী। গ্রাহক সংখ্যা এখনও মনে আছে, ৩৩৮৭। ১৯৭০ সালে যখন একাদশ শ্রেণী, এবং তার পরেই যখন কলেজ-ছাত্র, 'সন্দেশ'-এ দু'-একবার ছড়া লিখেছি।

মৃদুল দাশগুপ্ত
প্রযত্নে, আজকাল
৯৬ রামমোহন রায় সরণি
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশের আগে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এত প্রচার, বিজ্ঞাপনের চমক—এ-সব দেখে মনে করেছিলাম, পত্রিকাটি আগে বের হোক নতুন চেহারায়, জোরালো একটা সমালোচনা পাঠাব। কিন্তু না, 'সন্দেশ' (মে ২০০৫) হাতে পড়তেই সমস্ত রাগ, মান-অভিমান গেল জল হয়ে। মন ভরে উঠল আনন্দে।

গতকাল কলেজ স্ট্রিটের 'পাতিরাম' থেকে কিনলাম একটি 'সন্দেশ'। হাতে নিয়েই এর মিষ্টতা অনুভব করলাম। বাড়িতে দেখামাত্রই কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল, ছোট বড় সবার মধ্যে। ১০০ পৃষ্ঠার এই রঙিন পত্রিকা, বাঘা বাঘা লেখকদের লেখা—মাত্র ১০ টাকায়, কোনওভাবেই ভাবা যায় না! শিল্পী সমীর সরকার সাম্প্রতিক সময়ে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। তাই 'সন্দেশ'-এর প্রচ্ছদ অর্থবহ ও ভালো হবে, এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বুদ্ধদেব গুহ-র ধারাবাহিক উপন্যাস 'ফোটা কার্তুজের গন্ধ' ও রাজশ্রী রাহার 'রান্নাবান্না'য় অলঙ্কৃত ছবি হৃদয়কে টানে, মনকে নাড়া দেয়, ভাবায়। যেমন ভাবায় প্রচ্ছদ। প্রমোদ বসুর কবিতা 'ইচ্ছে পুষি' আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে।

প্রচ্ছদের ওপর বড় করে '১০ টাকা' লেখা বেমানান। এই পত্রিকা ২০ টাকা দাম হলেও সবাই কিনবে, পড়বে। কার্টুন ও কমিক্স রঙিন হলে বেশি ভালো লাগত। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' ধারাবাহিক চিত্রনাট্যটির কিস্তি আর-একটু বড় হলে ভালো হয়। পড়তে পড়তে তাড়াতাড়ি শেষ হলে মনখারাপ লাগছে।

শুধু দুই সম্পাদক নয়, বিশাল এই কর্মকাণ্ডের পেছনে যাঁরা রয়েছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাঁরা এই পত্রিকা বের করছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই শ্রদ্ধা ও আন্তরিক অভিনন্দন।
ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, 'সন্দেশ'কে সচল রাখুন।

আনসার উল হক
পদ্মপুকুর কাজিপাড়া। বারুইপুর
কলকাতা ৭০০১৪৪

আবুল বাশার—এদের হাতে 'সন্দেশ' নতুন পোশাকে, নতুন মেজাজে স্বপ্ন ফিরি করছে।
নতুন অকাজের 'সন্দেশ'কে আমার শুভেচ্ছা।

গৌর বৈরাগী
এ সি চ্যাটার্জি লেন। চন্দননগর
৭১২১৩৬

আসা-যাওয়ার পথে ওই-যে বিশুর বুকস্টল, ওখানে রোজদিন একবার চোখ যাবেই। খবরের কাগজ, কেরিয়ার গাইড, সে-আর, ফ্যাশন, আরও সব রঙিন রঙিন। সব দরকারি কাগজ। একটাও অকাজের নেই। আহা, বিশুর আর দোষ কী! কেউ কি আজকাল অকাজের কাজ করে?
আজ হঠাৎ মানকুণ্ডু স্টেশনে বিশুর স্টলে চোখ-দুটো আটকে গেল আঠায়। খুব যে ডাঁটো রঙ তা নয়, চাপা অথচ ভারী জেল্লাদার 'সন্দেশ'। দেখি দেখি, হাতে নিয়েই—আহা, কী আনন্দ...! শুধু হাতে নিয়েই? মিথ্যে বলব না, অফিসে এসে লুকিয়ে একবার দেখার ইচ্ছে হল। ভেতরে একটা কাণ্ডই ঘটেছে বটে! সমীর সরকার, সরল দে, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়,

এই নবসাজের 'সন্দেশ' কারও ভালো না-লেগে থাকতে পারে না। এমন মনকাড়া প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ শুধু ছোটদের কেন, বড়দেরও মুগ্ধ করবে। পুরনো 'সন্দেশী' সুজয়বাবুর প্রথম ছোঁয়ায় যদি এমন কাণ্ড ঘটতে পারে, তাহলে পত্রিকার জৌলুস যে উত্তরোত্তর বাড়বে, তা আশা করা আকাশ কুসুম হবে না নিশ্চিৎ। দুই সম্পাদক অন্তত এই মানও যদি ধরে রাখতে পারেন অক্লান্ত প্রচেষ্টায়, আমরা 'সন্দেশ'-এর পাঠকবর্গ নিজেদের ধন্য মনে করব।
যুগ যুগ জিও 'সন্দেশ'।

মুকুল মাইতি
২২৫ শ্রীরামপুর (উত্তর)। গড়িয়া
কলকাতা ৭০০০৮৪

রঙের ঝালরে 'সন্দেশ'-এর নতুন সাজ কিশোরদের ভুবনে বাজনা বাজাবে নিশ্চয়ই। আমরাও পুলকিত এমন কাগজ পেয়ে। তরতর করে পড়ে গেলাম এদিক ওদিক। মহাশ্বেতা দেবী ও লীলা মজুমদার যে-ভাবে সম্পৃক্ত করেছেন গল্পে, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় পারেননি। নবনীতা দেব সেন খুবই আন্তরিক। সুজয় সোমের 'গল্প-সল্প' সময়োচিত অবশ্যই, তবে কিছুটা অগোছালো মনে হয়েছে আমার। সব্যসাচী চক্রবর্তীর লেখাটি উপভোগ্য। ধারাবাহিক উপন্যাসে বুদ্ধদেব গুহ দারুণ চৌম্বক আবেশ ছড়িয়েছেন। ছড়া ও কবিতা বিভাগ বলিষ্ঠ। আবুল বাশারের বড়গল্প 'কোঁচ' কিশোররা কতটা গ্রহণ করতে পারবে জানি না, তবে আমি অভিভূত হয়েছি লেখাটি পড়ে—যা ক্লাসিক পর্যায়ের। 'কম্পিউটার! কম্পিউটার!' ভালো লেগেছে।

বিজ্ঞানকে আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের জীবন ও আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচয় ঘটালে ভালো হয়। শুধু ফুটবল আর ক্রিকেট নয়, গ্রাম বাংলার প্রায় হারিয়ে যাওয়া খেলাধুলোর বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। পরিবেশের নানা বিষয় নিয়ে, সামাজিক নানা সমস্যা নিয়ে ছোটদের উপযোগী লেখা প্রকাশ করলে ভালো হয়। শিল্পীরা লিখতে পারেন ছবির কথাও।

অবশ্য আপনারা তো লিখেছেন ঝুলিতে অনেক স্বপ্ন আছে, আমরা বরং অপেক্ষা করি। আপনাদের নব পরিকল্পিত 'সন্দেশ' বাঙালি কিশোরদের রুচিকে সমৃদ্ধ করে তাদের একান্ত শ্বাস হয়ে উঠুক—এই কামনা করি। সেই রুচি তৈরি করুন, যা 'সন্দেশ'-এর আদর্শ এবং বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য। বাজার সার্ভে করে, বাণিজ্য বাণিজ্য করে বাঙালির মনুষ্যত্বের বীজকে কীটের মুখে ঠেলে দেবেন না—নববর্ষের পথ চলায় একান্ত এ অনুরোধ।

ডাকে আসা, অ-আমন্ত্রিত সেরা লেখাকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন, এটিও একটি শুভ লক্ষণ। ক্রমশ আপনাদের এই প্রতিশ্রুতিও পরীক্ষিত হবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ ধর
নুঙ্গি সানিপাড়া। বাটানগর
কলকাতা ৭০০১৪০

আমার খুব ভালো লেগেছে নতুন 'সন্দেশ'। আমার অনেক বন্ধুও 'সন্দেশ' কিনেছে। ওদেরও খুব ভালো লেগেছে। সবচেয়ে ভালো লেগেছে অনির্বাণ রায়ের 'হচ্ছেটা কী!' কবিতাটা। ছবিটাও খুব ভালো লেগেছে। আরও অনেকগুলো ছবি আর চণ্ডী লাহিড়ির কমিক্স ও লীলা মজুমদারের গল্পটা আমার ভালো লেগেছে। গৌরী ধর্মপালের গল্পটা পড়ে আমি মানে বুঝতে পারিনি। পরে মা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। নতুন ফেলুদা সব্যসাচী চক্রবর্তীর বেড়ানোর গল্পটাও মা আমাকে পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। শৈলেন ঘোষের উপন্যাসটাও পড়তে আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু লীলা মজুমদারের গল্পটার একটা জায়গায় কয়েকটা লাইন ছাপাখানার ভূতরা খেয়ে ফেলেছে বলে পড়তে অসুবিধে হয়েছে।

'সন্দেশ'-এর পাতায় ছোট ছোট হাস্যকৌতুক ছাপা হলে, আমার খুব ভালো লাগবে। প্রতি সংখ্যায় তিনটে চারটে করে ধাঁধা বের হলে ভালো হয়। 'রান্নাবান্না' বিভাগে রিম্পি যে রান্নাটা করেছে, সেটা আমি একদিন বাড়িতে করেছি। মা বাবা দিদি খেয়ে ভালো বলেছে।

অগ্নিভ ঘোষ
তৃতীয় শ্রেণী, পাঠভবন
কলকাতা ৭০০০১৯

❑ বৈশাখ সংখ্যায় লীলা মজুমদারের 'স্বয়ম্বর' গল্পের কয়েকটা লাইন ছাপা হয়নি—ছাপাখানার ভূত নয়, কম্পিউটারের ভূতরা এই কাণ্ড করেছে! তাই গল্পের ওই জায়গাটা আমরা এখানে ছেপে দিলাম। স স।

রাজপুত্রদের যে-যার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁরা চানটান করলেন, কাপড়-চোপড় পাল্টালেন, ফল-মিষ্টি খেলেন।

সন্ধ্যেবেলা জলসাঘরে গান-বাজনা হলো, মস্ত জাজিমপাতা ঘরে বিশাল ঝাড়লণ্ঠনের নীচে। মেয়েদের ততক্ষণে মুচ্ছোটুচ্চো কান্নাকাটি সেরে গেছে। তাঁরাও লাল নীল হলদে বেনারসি শাড়ি পরে, হিরে মুক্তো চুনি পান্নার গয়না এঁটে, নানান রকম অজন্তা এলিফ্যান্টা কবরী বেঁধে, চোখে সুরমা, ঠোঁটে পানের পিক, পায়ে আলতা, গায়ে সুগন্ধী মেখে, ঘরের একধারটা আলো করে বসেছেন। আর সে কী গান, সে কী বাজনা!

বজ্রধ্বজ থেকে থেকে নাক তুলে শুঁকছেন কোনও ভালো গন্ধটন্ধ পান কিনা। আর শ্যামলকুমার লুকিয়ে চুরিয়ে দেখে নিয়ে ঠাওর করতে চেষ্টা করছেন কোন মেয়েটা কাঞ্চনমালা।

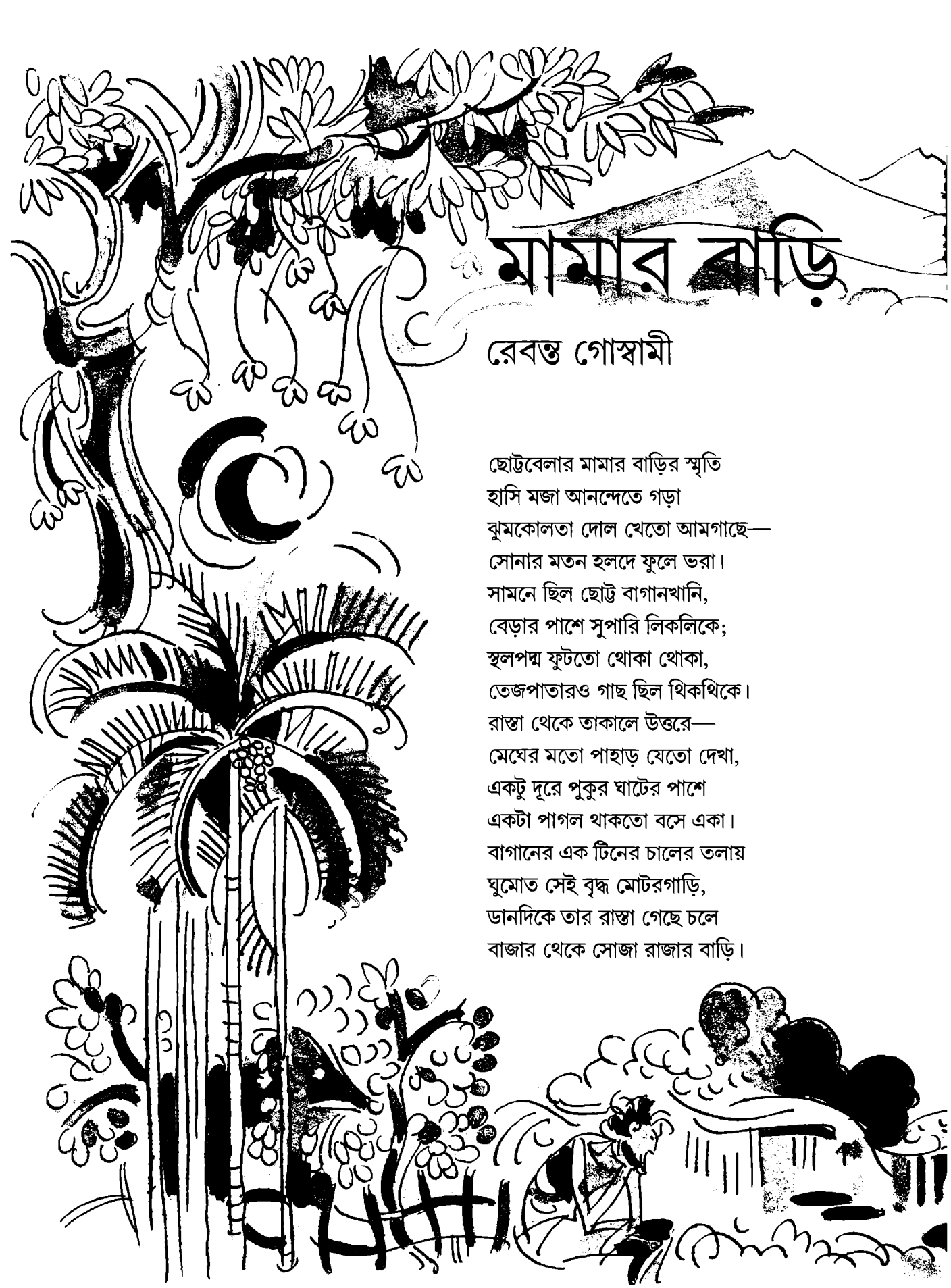

মামার বাড়ি

রেবন্ত গোস্বামী

ছোট্টবেলার মামার বাড়ির স্মৃতি
হাসি মজা আনন্দেতে গড়া
ঝুমকোলতা দোল খেতো আমগাছে—
সোনার মতন হলদে ফুলে ভরা।
সামনে ছিল ছোট্ট বাগানখানি,
বেড়ার পাশে সুপারি লিকলিকে;
স্থলপদ্ম ফুটতো থোকা থোকা,
তেজপাতারও গাছ ছিল থিকথিকে।
রাস্তা থেকে তাকালে উত্তরে—
মেঘের মতো পাহাড় যেতো দেখা,
একটু দূরে পুকুর ঘাটের পাশে
একটা পাগল থাকতো বসে একা।
বাগানের এক টিনের চালের তলায়
ঘুমোত সেই বৃদ্ধ মোটরগাড়ি,
ডানদিকে তার রাস্তা গেছে চলে
বাজার থেকে সোজা রাজার বাড়ি।

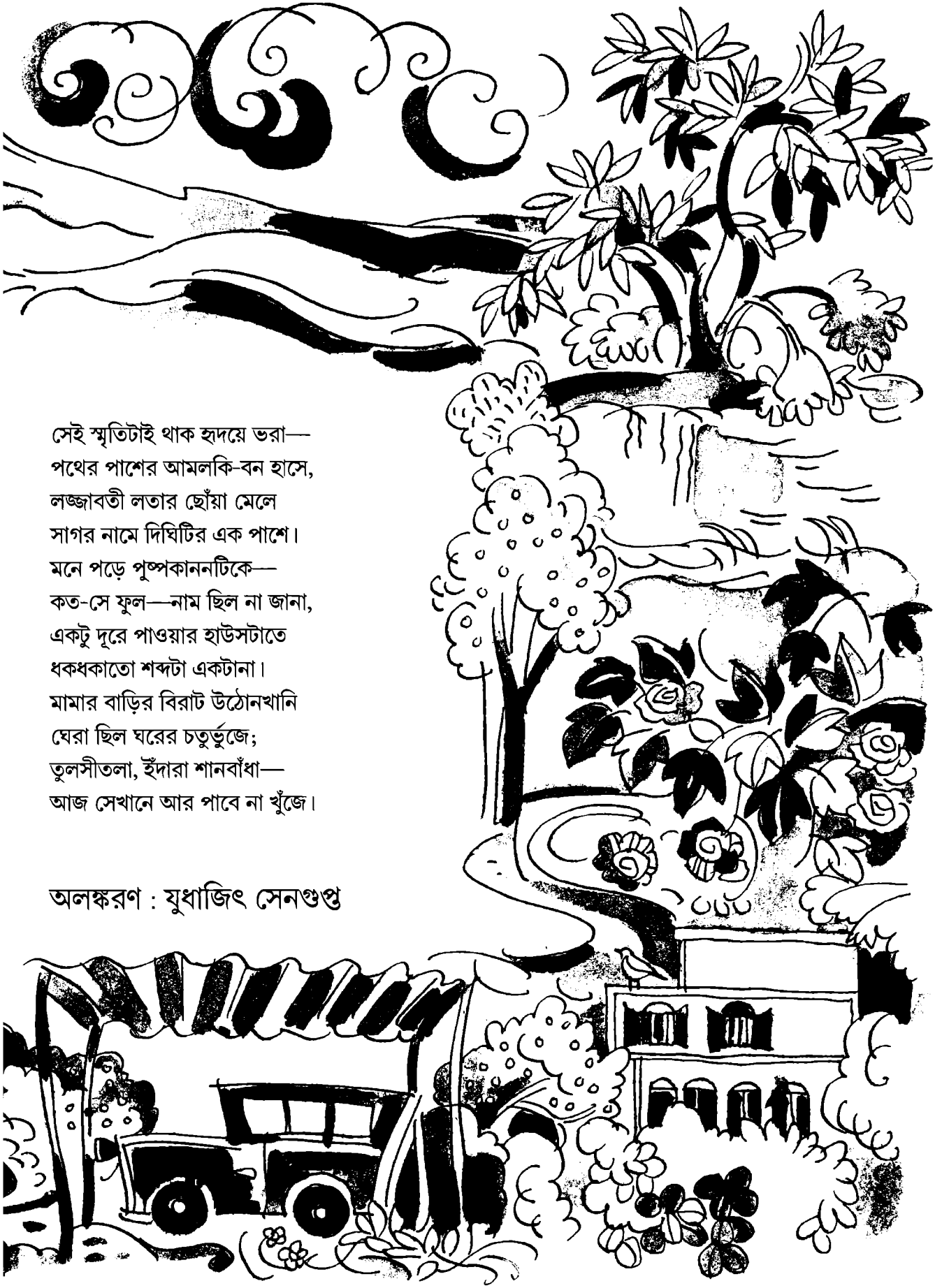

সেই স্মৃতিটাই থাক হৃদয়ে ভরা—
পথের পাশের আমলকি-বন হাসে,
লজ্জাবতী লতার ছোঁয়া মেলে
সাগর নামে দিঘিটির এক পাশে।
মনে পড়ে পুষ্পকাননটিকে—
কত-সে ফুল—নাম ছিল না জানা,
একটু দূরে পাওয়ার হাউসটাতে
ধকধকাতো শব্দটা একটানা।
মামার বাড়ির বিরাট উঠোনখানি
ঘেরা ছিল ঘরের চতুর্ভুজে;
তুলসীতলা, ইঁদারা শানবাঁধা—
আজ সেখানে আর পাবে না খুঁজে।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

নেতা দেখার দৌড়

টেবিলের ওপর রাখা যায় এমন ছোট-একটা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি, কলকাতা থেকে উপহার এনেছে আমার এক বন্ধু। সে-উপহার নিয়ে গর্বের আর শেষ নেই আমার। গর্ব, কেননা, একে তো ও-রকম ছিমছাম সুন্দর একটা ফ্রেম আমাদের অঞ্চলে পাওয়াই যায় না মোটে, আর তার ওপর এর ভিতরের ছবিটা কার? এ-হলো একেবারে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর! এতদিন যা আবছা ছিল, সেই আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের গৌরবকথা ততদিনে জানা হয়ে গেছে সবার। গোটা ভারত জুড়ে একটাই তখন ধ্বনি : জয় হিন্দ্! একটাই আবেগ সবার মুখে মুখে : কদম কদম বঢ়ায়ে যা! রূপকথার নেতা তখন একজনই : সুভাষচন্দ্র বসু! নেতাজি সুভাষ! রহস্যভরা জীবন, অদৃশ্য এক মানুষ। সেই তাঁরই এমন চমৎকার একটা ছবি আমার দখলে, আমারই একেবারে নিজস্ব—গর্ব হবে না?

কিন্তু শুধু ছবি থাকলেই তো হলো না। তেরো বছর বয়স হয়ে গেল, দেশের কাজও তো কিছু করা চাই? ইংরেজদের ভারত ছাড়তে বলা হচ্ছে তো কতদিন ধরেই। যাবে কি তারা? বোঝা যায় না সেটা। তাই লড়াই চাই। আর সে-লড়াইটা তো সবাইকেই করতে হবে এখন, তাই না?

কাজেই একদিন বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ি। মায়ের কাছে চেয়েচিন্তে নেওয়া কয়েকটা পয়সা দিয়ে কিনে ফেলি এক গান্ধিটুপি। বাকি রইল শুধু একটা জহরকোট। সেটাও যদি জোগাড় হয়ে যায়, তাহলে তো ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ের আর বাকি থাকে না কিছু!

জহরকোট পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই অবশ্য খতম হয়ে গেল সব। অত্যুৎসাহে বাবার সামনেই সেই টুপি-মাথায় বেরিয়েছি একদিন, ভেবেছি যে পুত্রগৌরবে বেশ স্ফীতই হবে পিতৃবক্ষ। কিন্তু হয়ে গেল উলটো! বাবা বললেন, 'এটা কী হয়েছে? এ বাঁদরামোটা করতে কে শেখাল? ভেবেছিস কী? টুপি মাথায় দিলেই কি কর্মী হওয়া যায়? কী বুঝিস তুই রাজনীতির? খোল্ শিগগির, খুলে ফ্যাল ওটা—'

অগত্যা লুকিয়ে ফেলতে হলো অত সাধের টুপি। পুলিস আসছে খবর রটে গেলে মাঝে মাঝে লুকিয়ে ফেলতে হয় নেতাজির ছবিটাও। নিজেকে মনে মনে আশ্বাস দিই তখন : এই-যে লুকিয়ে ফেলতে হচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ, এটাও তো একটা রাজনীতির কাজ। এটাই তো দেশের কাজ। নইলে পুলিশ কেন আসবে আমাদের বাড়িতে?

কিন্তু এর চেয়েও বড় একটা কাজ-কাজ ভাব হলো একদিন। বন্ধুদের কাছে শোনা গেল সামনের জংশন স্টেশন পেরিয়ে যাবেন অরুণা আসফ আলি, গৌহাটি-ফেরত পথে কয়েক মিনিটের বক্তৃতাও দেবেন তিনি স্টেশনের প্লাটফর্মে। একজন নেত্রী চলে যাবেন মাত্র এই পাঁচ মাইল দূরের পথ দিয়ে, আর আমরা পড়ে থাকব এখানে? তাঁর ভাষণ শোনাটা কি আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না?

টুপিটাকে পকেটে পুরে তাই চললাম সেই জংশন স্টেশনে। বাবার চোখের আড়াল হলে টুপিটা পরে নিতে আর দোষ নেই। প্লাটফর্মে জড়ো হয়েছে বেশ কিছু লোকজন, আমরাই-বা তাদের থেকে কম কীসে?

ধেয়ে এলো ট্রেন। জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে নেমে এলেন অরুণা আসফ আলি। জ্যান্ত একজন নেত্রীকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে আমরা স্তব্ধ। তাঁর উড়ো-উড়ো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে মুখের দু'-পাশে, মুখখানা শুকনো, পোশাকেআশাকে বেশ আটপৌরে ভাব। ভালো লাগল আমাদের, এইকম ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্তই তো হবার কথা একজন নেত্রীর!

ফিরে এসে যখন হাত-পা নেড়ে মাকে বোঝাচ্ছি কী উনি বললেন, কীভাবে বললেন হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে কাজ করবার কথা, ঠিক তক্ষুনি হাজির হলেন বাবা। গলায় বেশ ঝাঁঝ নিয়েই বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলি।'

শঙ্খ ঘোষ

অল্পবয়স কল্পবয়স

আমাকে অধোবদন আর নিরুত্তর দেখে জবাব দিলেন মা, খানিক প্রশ্রয় মাখিয়ে : 'গিয়েছিল একটু অরুণা আসফ আলিকে দেখতে, ঈশ্বরদি স্টেশনে।'

'অরুণা আসফ আলি? সেও একটা দেখবার লোক হলো? তাও ঈশ্বরদি পর্যন্ত গিয়ে? আশ্চর্য!' বলে চটির আওয়াজ করতে করতে চলে গেলেন বাবা।

কংগ্রেসের এত বড় নেতা আসফ আলির স্ত্রী, নিজেও এত বড় কর্মী একজন, ছুটে বেড়াচ্ছেন এ-রাজ্য ও-রাজ্য, ভাষণ দিচ্ছেন স্বাধীনতার, তিনি দেখার যোগ্য লোক নন? নেতা নন তিনি? রাজনীতির এ-উত্তেজনা দেখেও আমাদের কাজের বিষয়ে কোনও সম্ভ্রমের বোধ হলো না বাবার? যাব্বাবা! মনখারাপ হয়ে গেল আমার।

কিন্তু তারপর একদিন যখন শোনা গেল এবার আসছেন জওহরলাল নেহরু, তখন? তখন কোথায় রইল বাবার জারিজুরি? 'যাব দেখতে?' শুনে এবার বলতেই হলো তাঁকে : 'জওহরলাল? হ্যাঁ, তা যেতে পারিস। তবে সাবধানে যাবি। ভিড় হবে কিন্তু খুব।'

আবার পকেটে পুরে নিই গান্ধিটুপি। বন্ধুদের সঙ্গে উত্তেজনায় চলতে থাকি পাঁচ মাইল। আজ জওহরলাল। রাজনীতির যুবরাজ তিনি। রবীন্দ্রনাথ নাকি কবে বলেছিলেন বসন্ত, ঋতুরাজ। সেই জওহরলাল। সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে ভালো কথা বলেননি বলে তাঁর ওপর রাগ করেছিল সবাই। করবারই তো কথা। কিন্তু সে-রাগ মিলিয়ে গেছে এখন। আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের বন্দিদের বিচার হবে শুনে জওহরলাল বলেছেন, বন্দিদের পক্ষে ব্যারিস্টার হয়ে দাঁড়াবেন তিনি নিজে। সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি সবার চোখের মণি।

প্লাটফর্মের উপর তৈরি হয়েছে নিচু একটা মঞ্চ। তার উপরে ছোট একখানা টেবিল, পিছনে চেয়ার। আর তারও পিছনে, বেশ একটু উঁচুতে, সাদা কাপড়ের পটভূমির ওপর মস্ত একখানা ছবি। কার ছবি? কার আবার! নেতাজির। ঠিক হলো কি এটা? গান্ধিজির নয়, কংগ্রেসের অন্য কোনও নেতার নয়, শুধুমাত্র নেতাজির ছবি? বিগড়ে যাবেন না তো উনি?

ওই আসছে আসাম মেল। উতলা হয়ে উঠছে সবাই। 'জয় হিন্দ্' আর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে ভরে যাচ্ছে বাতাস। ট্রেন থামবার আগেই দেখা যাচ্ছে হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন নেতা। ঝকঝকে পোশাক, টকটকে উজ্জ্বল মুখ, মাথায় গান্ধিটুপি। অরুণা আসফ আলির একেবারে উলটো।

গাড়ি থামতেই ঝাঁপ দিয়ে নামলেন কামরা থেকে। ভিড়ের মধ্য দিয়ে গসগস করে এগিয়ে এসে উঠে পড়লেন মঞ্চে। কেউ কিছু বলবার আগে, কেউ কিছু বুঝবার আগে, লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন টেবিলটার উপর। টেবিলে কেন? ঝনাৎ করে এক পাক ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি নেতাজির ছবিটার ঠিক মুখোমুখি, সমান উচ্চতায়, জনতার দিকে পিছন ফিরে। আর তারপর, জোরালো গলায় 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি তুলে স্যালুট করলেন ওই ছবিকে। গোটা প্লাটফর্ম ভরে উঠল জনতার প্রতিধ্বনিতে। মুহূর্তমধ্যে মন জিতে নিয়ে, টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে, মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে, যেমন এসেছিলেন তেমনভাবেই ফিরে গেলেন ট্রেনের কামরায়, দাঁড়ালেন আবার হাতল ধরে। বললেন, 'কোনও ভয় করবেন না, স্বাধীনতা আমরা পাবই। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলে সময়মতো পৌঁছবে না এই গাড়ি। সেটা অন্যায় হবে। আপনারা যে-যার মতো কাজে ফিরে যান। জয় হিন্দ্।'

শুনতে শুনতে, লোকজনের ফাঁক-ফোঁকরের মধ্য দিয়ে, ছোটখাটো আমি কখন এসে দাঁড়িয়েছি একেবারে সেই কামরার গায়ে গায়ে। জওহরলাল আর আমার মধ্যে দূরত্ব তখন দু'-ফুট। এ-সুযোগ কি ছাড়া যায়, ছাড়া উচিত? আর কি কখনও পাব এমন কাছে? প্রণাম করবার মতলব নিয়ে নিচু হয়ে বাড়িয়ে দিই হাত।

আর সঙ্গে সঙ্গে, এক ঝট্‌কায় পা সরিয়ে নিয়ে, একটুখানি পিছিয়ে গিয়ে বললেন সেই রাজনীতির যুবরাজ : 'কভি নেহি। উচা রাখ্না শির।'

চম্‌কে গিয়ে মাথা তুলি, চোখে চোখে সংযোগ হয়, সরে যেতে থাকে ট্রেন, হাতল ধরে সমবেত জনতার উদ্দেশে হাত নাড়তে থাকেন উনি, মিলিয়ে যায় গাড়ি।

মাথা উঁচু করেই ফিরে আসি আমরা।

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

বনের ভাষা

জীবন সর্দার

আছে নাকি বনের নিজের কোনও ভাষা? আমরা প্রকৃতি-পড়ুয়ারা, দেখে-শুনে বুঝেছি, 'ভাষা' শুধু অর্থ করলে বোঝা যায় এমন কোনও শব্দ নয়। নিঃশব্দে নীরবে অনেক কথা বলা যায়—নানা ইশারায়। ইশারার ভাষা।

যেমন, গাছে ফুল ফোটে চুপচাপ। কিন্তু প্রজাপতি, মৌমাছি—যাদের ফুলের মধু, রেণু দরকার—তারা বুঝে যায় ফোটা ফুলের ভাষা। আসলে গাছেরই ভাষা। পোকাগুলো যেমন গাছের ভাষা ফুলের ইশারায় বুঝে যায়, পাখিরা তেমনি পাকা ফলের ইশারায় গাছের ভাষা বুঝে নেয়। আমরা কি আর ওই ভাষা কম বুঝি!

সত্যি, বনের ভাষা আমরা কম বুঝি। বনে যাঁরা থাকেন—আদি বনবাসী যাঁরা—বনের ভাষা ওঁরা যতটা বোঝেন, আমাদের চেষ্টা হবে—পারলে ততটা জানার। এককালে মানুষ জাতটার এমনটাই ছিল—বনে জন্ম, বনেই ছোটবেলার খেলা, বড় হয়ে বনেই খাবার খোঁজার কাজ। বীজ বুনে গাছ হয়—এই কাণ্ডটা বনে থাকতেই বুঝেছিলেন তাঁরা। কিন্তু বন সাফ করে, সেই জমিতে বীজ বুনে চাষ করার এই বিদ্যেই তাঁকে সভ্য করে তুলল। তাই নাকি? আসলে তখন থেকেই বনের ভাষা ভুলে, নিজের খুশি-মতো কাজ করার ইশারা পেয়ে গেল মানুষ। তারপর সুখের সঙ্গে দুঃখও সঙ্গী হয়ে চলল। মানুষের ইতিহাসের সেদিনের কথা ভুলে, এখন আবার প্রকৃতি-পড়ুয়াদের সঙ্গে ফিরে যেতে চাই বনে। বনের ভাষা বুঝি কী বুঝি না, তা দেখতে চাই।

আমাদের এই বঙ্গে বনের ঐশ্বর্য ছড়ানো। দক্ষিণে নোনাজল মিঠেজলের জোয়ার-ভাটার বাদাবন। মধ্যিখানে লাল শুখামাটির শাল-সেগুনের আদিবন। উত্তরে হিমালয়ের পায়ের কাছে তরাইবন, আর গা-বেয়ে উঠলে ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশে সরল গাছের বন। মজা এই, সব বনের 'ভাষা' এক নয়।

বাদাবন দেখতে হবে জলপথেই। দুই দ্বীপের মাঝের খাড়ি বা খাল দিয়ে নৌকোয় ভেসে ভেসে। ডাঙায় নামব, তবে যেখানে অনুমতি পাব। সেখানে নজরমিনারে উঠে দূরের গাছপালার, কাছেরও, নমুনা চেনার চেষ্টা করব। তবে জলপথের ধারে ধারে কোন গাছ কেন অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বুঝতে পারলে অনেক জ্ঞান সঞ্চয় হবে। জঙ্গলে ঢাকা দ্বীপের গায়ে জলের কিনারায় কেন বা কেমন করে ধানি ঘাসের আগমন, সে-ভাষার অর্থ বুঝলে, নতুন বনের সৃষ্টিকথার কিছুটা বুঝতে পারব। এই বনের মানুষ—যাঁরা বসতি করে রয়েছেন—তাঁদের ভাষা উচ্চারণ ইতিহাস আমাদের জানতে হবে।

বাদাবনের গাছ বাইন, গরান, গেঁও, গর্জন, গোলপাতা, হেঁতাল আর সুন্দরী গাছের নমুনা মধ্যবঙ্গের লালমাটিতে দেখতে পাব না। ওইসব গাছের ভঙ্গিমা, পাতায় ডালে ফুলে ফলে যে ইশারা, সেটা ওখানেই সাজে। এটা সত্যি।

আরও সত্যি জানতে হলে, ছয় ঋতু বারো মাস ওই বনের কিনারায় কিনারায় ঘুরে দেখা দরকার। আচ্ছা, যাব।

তার আগে দুঃখের কথা। শাল-শিশু-সেগুনের ঘনবন লালমাটির ডাঙায় আর দেখতে পাই না। প্রকৃতির আপন খেয়ালে, তার নিয়মে গড়ে-ওঠা বনের জায়গায় মানুষের বুদ্ধির ইচ্ছার গাছগুলো লাগিয়ে বন বানানো হচ্ছে। বন হচ্ছে। সেখানে গেলেও সেই বনের কথা শোনার ইচ্ছে হবে। তবে জানো কি, প্রকৃতির নিয়মে তৈরি বন, আর এই সোনাঝুরি আকাশমণি গাছের বনের অনেক তফাৎ। আর তফাৎ এখানে যাঁরা আদিকাল থেকে আছেন, তাঁদের ভাষা, আচার-আচরণ। যা দেখে শিখব।

প্রকৃতির নিয়মে বেড়ে-ওঠা বনে সবার সমান অধিকার। খুব রোদ আলো যে-গাছের দরকার, সোজা উঠে যায় তারা। পাতার ফাঁক দিয়ে যতটুকু আলো নেমে আসে, মাঝের গাছগুলো সেটা পেয়ে যায়। একদম নীচের তলায় ঝোপঝাড় কম-বেশি আলো জল হাওয়া পেয়ে বেড়ে ওঠে ও বেঁচে থাকে। তিন থাকে পোকা পাখির আনাগোনা তিন ধরনের। ফসলের ভাজে ভাজে যারা থাকে, তারাও এক নয়। দিনের পর দিন দেখে দেখে এই ভাষা বুঝতে হবে। এখানে এই বনে তা হবে কম।

হিমালয়ের তলায় তরাইবনে ঢোকার আগে গন্‌গনির মাঠে দাঁড়াব। এমন ছিল একসময়— মাঠ নয়, ঘন বনে ঢাকা। তখন নাম ছিল জঙ্গলমহল। এখন তা নিরুদ্দেশ। যেমন, তরাই সাফ করে চায়ের বাগান হয়েছে হিমালয়ের পায়ের কাছে। গন্‌গনির মাঠ ঢাকা পড়েনি তেমন কোনও গাছে। যখন হবে, তখন আসব ফের।

তরাই এখনও নিরুদ্দেশ হয়নি। বনের ভেতর পাকা রাস্তা হয়েছে। গড়গড়িয়ে আসা-যাওয়া চলবে। তাই সেখানে প্রকৃতির ছোঁয়ায় বনের বাড়বাড়ন্ত দেখব, দু'-চোখ মেলে 'বনের ভাষা' বোঝার চেষ্টা করব :

(১) বাদাবনের গাছের সঙ্গে কিছু মিল আছে কি এই বনের গাছেদের?

(২) এই বনের গাছগুলো কি সারা বছর সবুজ থাকে? নাকি পাতা ঝরে যায়, বছরের কোনও কালে?

(৩) ছোট গাছ ও বড় বড় গাছগুলোর তুলনা করে দেখব পাতার গড়ন,. কাণ্ডের গড়ন।

(৪) গাছের বীজ কুড়িয়ে পেলে নমুনা নেব, দেখব কেমন করে বীজ ছড়ায়।

(৫) এক গাছের সঙ্গে অন্য গাছের দূরত্ব দেখব। মাঝের ফাঁকে ঝোপঝাড়ের রকমসকম, তাতে পাখি পোকা প্রজাপতির খোঁজ নেব।

তারপর পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠে সরলবনের বনে পৌঁছে, তখন ভাবব বনের ভাষা কিছু বুঝেছি কী বুঝিনি।

নামাঙ্কন : অমল চক্রবর্তী। অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

নিবেদন করছে

phone
22475719
22473760
fax
22471436

অনিরুদ্ধ দেব

মনের কথা কই

চাপ নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকা! স্ট্রেস!

অনেক সময়েই নেমন্তন্ন বাড়িতে বা অন্য কোথাও—কারও সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে বলা হয়—'ইনি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট'—কেউ-না-কেউ এসে জানতে চান, 'এত মানসিক রোগ বাড়ছে কেন? চারদিকে এত স্ট্রেস!' যেন স্ট্রেস আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে! অথবা ঝোপের আড়ালে বাঘের মতো ওঁৎ পেতে আছে!

ডাক্তারি মতে, যা-কিছু আমাদের শরীরের ভারসাম্যকে টলিয়ে দেয়, তাই স্ট্রেস। জীবিত শরীর সর্বদাই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই ভারসাম্য সবসময়েই এদিকে ওদিকে টলছে। দশটার ক্লাসে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে, তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে পায়ের আঙুলের নুনছাল উঠে গেল, সেইসঙ্গে ক্লাসে পৌঁছে বকুনি খাবার ভয়... সেটা যেমন স্ট্রেস, তেমনি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে খিদে পেল, অমনি শরীরের স্ট্রেস তৈরি হল। তেল-চুপচুপে মোগলাই পরোটা খেলাম, শরীরের দায়িত্ব হজম করতে হবে, সেটাও আর-একটা স্ট্রেস বইকী!

রোজকার স্ট্রেস বলতে আমরা বুঝি মানসিক কষ্ট তৈরি করার মতো ঘটনা, অনুভূতি বা চিন্তা (অবশ্য অনুভূতি বা চিন্তা সাধারণত ঘটনা থেকেই সৃষ্টি হয়)—যেগুলো সামলাতে গেলে মনের ওপর চাপ তৈরি হয়। সেই চাপ যদি বেশি হয়, মন অমনি হাল ছেড়ে দেয়। হাল ছেড়ে দিলে অনেক সময়ে মনের অসুখ হয়, আর আমার মতো লোককে শুনতে হয় : 'লেখাপড়ায় কী ভালো ছিল ছেলেটা, আজকাল এত স্ট্রেস...'

স্ট্রেস মানেই প্রচণ্ড চাপ, আর চাপ মানেই যে মনের কষ্ট, আর মনের কষ্ট থেকে মনের অসুখ হবেই, তা কিন্তু নয়। অনেক সময়ে চাপ না-থাকলে, কাজ করতে উৎসাহ পাই না। পড়াশোনা করি কী না-করি, পরীক্ষায় পাশ হবেই—এ-কথা জানা থাকলে, আমরা ক'জন ঠিক করে পড়াশোনা করব হাত তোলো...অনেক হাত উঠল কি?

স্ট্রেস আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী। স্ট্রেস-এর ফলেই আমরা ভালো ফল করতে উদ্বুদ্ধ হই। স্ট্রেস-ই আমাদের কাজে উৎসাহ আর শক্তি জোগায়। তবে স্ট্রেস বেশি হলে আমাদের পক্ষে সামলানো কঠিন হয়, মন ভেঙে পড়ে। সেজন্য স্ট্রেস-কে সবসময় আগলে রাখতে হয়। স্ট্রেস আমাকে কন্ট্রোল করলে, কখন যে আমার দিন-রাত, আমার জীবন, ভাবনা-চিন্তা, আমার পরিস্থিতিকে সামলানোর ক্ষমতা... সবকিছুকে নষ্ট করে দেবে, তা আমি নিজেই বুঝতে পারব না।

কথাটা বলা সহজ, বোঝাও কঠিন নয়। কিন্তু করা অত সহজে না-ও হতে পারে। স্ট্রেস আমি তৈরি করি না, স্ট্রেস তৈরি হয় আশপাশের পরিস্থিতি থেকে। আমার মা-বাবা আমার কাছে কী চাইছেন, তা থেকে। আমার শিক্ষকরা স্কুলে কিংবা কোচিং সেন্টারে কী করছেন, তা থেকে। আমার বন্ধুরা আমার সম্বন্ধে কী ভাবে, আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করে, তা থেকে।

আমি যথাসাধ্য পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিলাম, রেজাল্ট দেখে মা দু'-দিন কথাই বললেন না। বাবা বললেন, 'তোর জন্য অফিসে কারও কাছে মুখ দেখানোর জো নেই।' তিন রাত জেগে জিওগ্রাফির প্রোজেক্ট শেষ করলাম, যেদিন জমা দেবার কথা, ধুম জ্বর, স্কুলে যেতে পারলাম না। দু'-দিন পর যখন গেলাম, টিচার বললেন, 'শেষদিন পেরিয়ে গেছে। এখন আর জমা নেবো না।' যে প্রোজেক্ট-এ অন্তত দশে আট পেতাম, তাতে দিলেন দুই। সায়ন্তন আমার পাশে বসে, আমার থেকে দেখে অঙ্ক করে পরীক্ষায়, তাকে বললাম, 'গত দু'-দিন কী পড়া হয়েছে, একটু লিখে নিতে দিবি?' সে অম্লানবদনে বলল, 'না রে। এখন তো সময় নেই। পরে নিয়ে নিস।'

এগুলোর কোনটা আমি সৃষ্টি করলাম? আর এইসব স্ট্রেস থেকে মুক্তি পাবই-বা কী করে? সেটাই আমরা একে একে বোঝার চেষ্টা করব পরবর্তী কয়েকটা সংখ্যায়।

তোমরা যদি চাও, তোমাদের মনের সমস্যা নিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দেবো। চিঠিটা পাঠিয়ে দাও 'সন্দেশ'-এর নতুন ঠিকানায়। কিম্বা ই-মেল করতে পারো। তোমার নাম-ঠিকানা, বয়েস, কী পড়ছ এখন—সব জানাবে।

নামাঙ্কন : দেবাশিস দেব

অলঙ্করণ : অমল চক্রবর্তী

আমের দিন

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হায় গরম রোদ চরম নিদ্রা কম দৃশ্যতই
শুকনো ঘাট জ্বলছে মাঠ ফাটছে কাঠ গ্রীষ্মতে—
মাঝ-দুপুর দুই কুকুর তৃষ্ণাতুর চোখ মেলে
চাইছে জল হায় বিফল অনর্গল ঢোঁক গেলে।
সূয্যিটার নেই বিকার দেয় দেদার তাপ খালি
এই খরায় মাঠ ভরায় শুষ্কপ্রায় ঘাস, বালি।
শুকনো মুখ তবুও সুখ তেমন দুখ পাচ্ছি নে
একটা নাম ভোলায় ঘাম—মিষ্টি আম খাচ্ছি যে।

অলঙ্করণ : চণ্ডী লাহিড়ি

অনিতা অগ্নিহোত্রী

নি শি ন্ত

ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে নিজেকে যতদূর পারা যায় লুকিয়ে বয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বাঁক নিয়েছে চম্পি নদী। সেই বাঁক থেকে তিরিশ গজ মতন দক্ষিণে গেলে উইলিয়াম আলবার্টসন কোম্পানির পাঁচিল। রাঙা বেলে পাথরের পাঁচিল, চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা। অনেকটা জমি কোম্পানির। নতুন একটা কারখানা আর অফিস হবে বলে ভিত খোঁড়া হচ্ছে। কাজ চলছে ঢিমে তালে। মজুর-মজুরনীরা দল-বেঁধে কাছের গ্রাম থেকে আসে, ক'দিন খুব গান গেয়ে 'হেঁইয়ো হেঁইয়ো' করে কাজ হয়। তারপর আবার সব সুনসান। কী ব্যাপার? না, বোরো ধান কাটতে গেছে সবাই। কী ব্যাপার? না, সংক্রান্তির মেলায় গেছে মামুদপুর। এইরকম।

পাঁচিলের ভিতরের জমিতে ইঁট, বালি, স্টোনচিপস্ এইসব বাড়ি তৈরির মালমশলা ঢেলে দিয়ে যায় লরি এসে। লাল পাঁচিলের সামনের দিকটায় মস্ত সবুজ গেট। গেটের মাথায় কাঁটা-কাঁটা বল্লম লাগানো। বড় গাড়ি এলে গেটের দুটো পাল্লা খুলে দেয় গার্ড। ছোটখাটো মানুষ, যারা বেঁকে-চুরে ঢুকতে পারে, তাদের জন্য ছোট্ট গেট বানানো আছে বড় গেটের টিনের পাত কেটে।

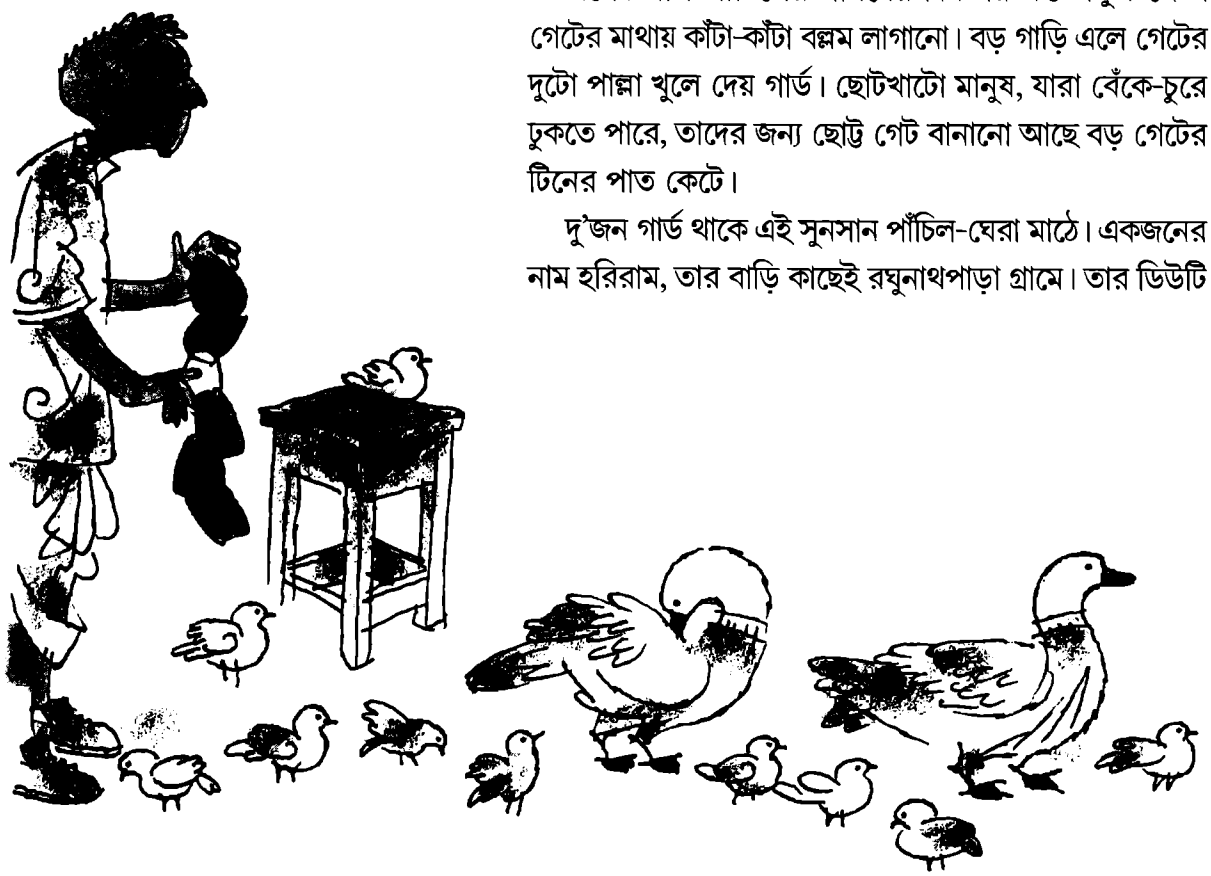

দু'জন গার্ড থাকে এই সুনসান পাঁচিল-ঘেরা মাঠে। একজনের নাম হরিরাম, তার বাড়ি কাছেই রঘুনাথপাড়া গ্রামে। তার ডিউটি

আর হাঁ সে রা

দিনে। সে সকাল আটটায় সাইকেল চালিয়ে আসে বাড়ি থেকে, আর সন্ধ্যেবেলা ফিরে যায়। রাতের গার্ড নিশিকান্ত। তার বাড়ি অনেক দূর। সেই উত্তরে, জলপাইগুড়ি জেলায় কালচিনি। নিশিকান্তর মাইনে এত কম, বছরে একবারের বেশি বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। বাড়ি দূরে বলেই তাকে দেওয়া হয়েছে রাত-ডিউটি। দিনে সে ঘুমোতে পারে, কিন্তু রাতে জাগতেই হবে তাকে।

দিনে ঘুমোনো—সেও আবার বড় মুস্কিলের ব্যাপার। কারণ দিনে থাকে সূর্যের আলো। হাজারখানা কাজ মানুষের এমন আছে, যা সূর্যের আলো ছাড়া করাই যায় না! যেমন, খুব করে সাবান দিয়ে কেচে যদি কাপড় ফর্সা করার জন্য মেলতে চাও, তা কি চাঁদের আলোয় হবে? চাঁদের আলোয় বড়ি দেওয়া যায় না, বাসন মেজে চমকানো যায় না, বাজারহাট করা যায় না। সবচেয়ে মুস্কিল—দিনের ঘুমের স্বপ্নগুলো কিছুতেই রাতের মতো হয়

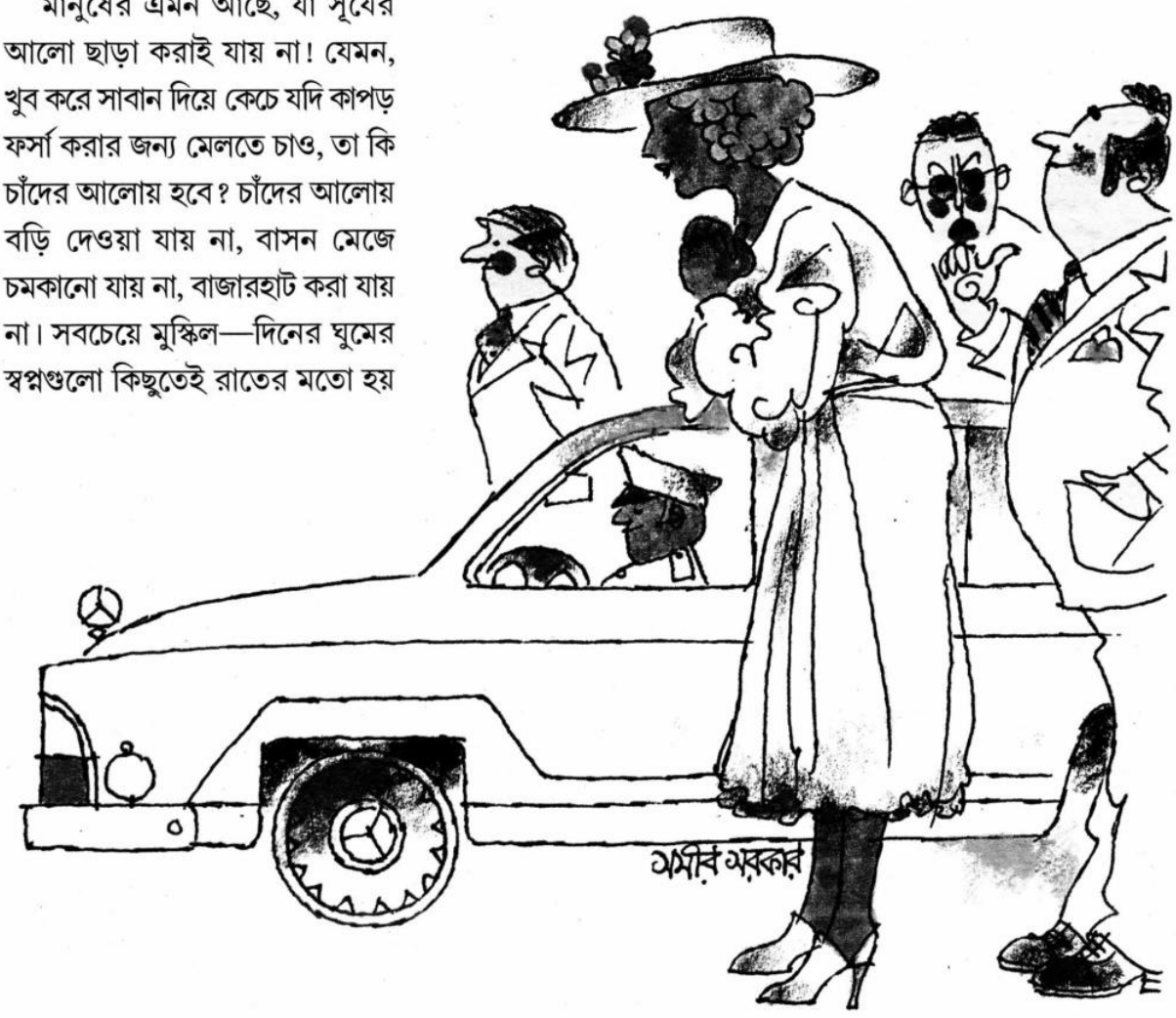

না। সব মিলিয়ে দিনের অর্ধেকটাই নিশিকান্তর যায় নিজের কাজকর্ম সারতে। রান্নাবান্না দু'-বেলার জন্য করে, ঝাঁটপাট দিয়ে, যখন সে ঘুমোতে যাবে, তখন বিকেল নামছে। ঘণ্টা চারেক গড়িয়ে নিতে-না-নিতেই, হরিরামের বাড়ি যাবার সময় হয়ে যাবে। আর সে নিশিকান্তকে ঠেলেঠুলে ঘুম থেকে তুলে, চা খাইয়ে, বাড়ির দিকে সাইকেল নিয়ে দৌড়বে।

সেই নিশিকান্ত দুটো হাঁস পুষেছে। সাদা ধবধবে প্যাঁক-প্যাঁক করে ডেকে মাঠ-মাথায়-করা দুটো হাঁস। এবার যখন সে দুর্গাপুজোয় বাড়ি গিয়েছিল, তখন ফেরার পথে তার মেয়ে জবা হাঁস দুটো দেয় নিশিকান্তকে। হাঁসেরা তখন খুবই ছোট্ট, এক মাসের মতো বয়স, হাড়গিলে চেহারা, হাঁটতে গিয়ে ল্যাক-প্যাক করে পড়ে যায়। মেয়ে আদর করে দিয়েছে, তাই নিশিকান্ত কিছু না-বলে নিজের মোটঘাটের মধ্যে একটা ঝোলায় হাঁসেদের নিয়ে এসেছিল তার ডিউটির জায়গায়।

নিশিকান্তর মনে ভয় ছিল, মেয়ে যদি জানতে চায় হাঁসেরা কেমন আছে, কী-ই বা বলবে। একে তো পাঁচিলঘেরা মাঠ, জনমানুষ নেই নিশিকান্ত ছাড়া। তার ওপর মাঠের মধ্যে ও আশেপাশে কুকুরেরা আছে, ভাম আছে, কেউ-না-কেউ হাঁসেদের জখম করে খেয়ে চলে যাবে যে-কোনও দিন। তবু নিশিকান্ত হাঁসেদের যত্নআত্তি করতে লাগল যথাসাধ্য। নিজের ভাতের সঙ্গে হাঁসেদের জন্য রাঙা ঢেঁকিছাঁটা চাল সিদ্ধ করে মাটির সরায় করে খাওয়ায়। হরিরামকে পয়সা দেয় প্রতি মাসে। সে হাঁসেদের জন্য খাবার আনে। এছাড়া 'হাঁস-মুরগি পালন বৃত্তান্ত' বলে একটা বই এনে দিয়েছে হাট থেকে কিনে। নিজের ঘরের বারান্দায় খড় ও মাটি দিয়ে হাঁসেদের জন্য ঘর বানিয়ে দিয়েছে নিশিকান্ত, তাতে সত্যিকারের দরজার মতো খিল-দেওয়া কাঠের দরজা। রাতে হাঁসেদের ঘরে ঢুকিয়ে, বাইরে থেকে হুড়কো বন্ধ করে দিতে হয়।

যত্নআত্তি পেয়ে, খাওয়াদাওয়া করে, মাস ছয়েকে নিশিকান্তর দুই হাঁস হয়ে উঠেছে মোটাসোটা, আর একটু গুণ্ডা প্রকৃতির। তারা কাউকেই ভয় পায় না, রাস্তাও ছাড়ে না। অচেনা লোক দেখলে বিকট প্যাঁক-প্যাঁক করে তেড়ে যায়। হাঁটে অবশ্য বড্ড ধীরে-সুস্থে। চলা দেখে মনে হয় এই পড়ল বলে উল্টে, কিন্তু আসলে উল্টোয় না।

হাঁস, নিশিকান্ত, হরিরাম সবাই বেশ মনের সুখেই ছিল। এবং মিস্ত্রিরা গড়িমসি করে মাস ছয়েকে কারখানা বাড়িটার ভিত তৈরির কাজ প্রায় শেষ করেই এনেছিল—এমন সময় বিপদ এলো একটা অদ্ভুত দিক থেকে। উইলিয়াম অ্যালবার্টসন কোম্পানির অ্যাসিট্যান্ট ম্যানেজার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তুলসিপুরের উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে এসেছিলেন। ওই গরমজলে স্নান করলে নাকি পুরনো বাত সারে। তাঁর হঠাৎ মনে হল—যাই, কোম্পানির ফিল্ড-অফিসটা দেখেই আসি। অ্যাসিট্যান্ট ম্যানেজার ভোলা বোস তাঁর নতুন কেনা গাড়িতে কোম্পানির মাঠের মাঝে পাতা সিমেন্টের রাস্তা ধরে যাবেন কী—স্পিড কমে প্রায় ঘণ্টায় আড়াই কিলোমিটার!

ভোলা বোস কখনও বিলেত যাননি বলে বড্ড ইংরেজি বলেন। ড্রাইভারকে রেগে বললেন, 'হোয়াই স্লো? ড্রাইভ ফাস্ট!'

ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'সামনে হাঁস দেখতেছেন না? হাঁসের ওপর গাড়ি চালাব নাকি?'

'দেন ওভারটেক।'

'ওভারটেক করতে গেলে হাঁসেরা আবার পথ ছেড়ে গাড়ির সামনে চলে আসে। সেই রকমই হেলে-দুলে হাঁটতে থাকে।'

'অদ্ভুত তো!'

দু'-মিনিটের রাস্তা এগারো মিনিটে পেরিয়ে ঘামতে ঘামতে ম্যানেজার গাড়ি থেকে নামলেন। যেখানে ভিতের কাজকর্ম চলছে, সেখানে দেখতে গেলেন। কাজের স্পিড আর কী হবে, যেখানে আড়াই কিলোমিটারের বেশি গাড়িই চলে না ঘণ্টায়। ম্যানেজারের সব রাগ গিয়ে পড়ল হাঁসেদের উপর!

তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামবে। নিশিকান্ত সবে তার কাজকর্ম রান্নাবান্না সেরে ঘুমের জোগাড়যন্ত্র করছিল। এমন সময় হরিরামের ডাকাডাকিতে তাকে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হল।

চম্পি নদীর বুক থেকে সন্ধ্যেবেলা যে ঠাণ্ডা বাতাস বয়, তা তখনও ওঠেনি। সূর্য পশ্চিমে নামছে, আর গনগন করা চেহারা নিয়ে মাঠ-ঘাটে রোদ ছড়াচ্ছে। বোসবাবুর মেজাজ খাপ্পা, হাতে একটা ডাব, তাতে স্ট্র নেই।

নিশিকান্তকে দেখে ভোলা বোস বললেন, 'এ হাঁস তোমার?'

'না তো স্যার!'

ভোলা বোস রেগে বললেন, 'তোমার নয়? তুমি পোষোনি এদের?'

নিশিকান্ত একগাল হাসল।

'পুষেছি বটে স্যার, তবে আমার কী করে বলি! পশুপাখি কি আর মানুষের হয়? তারা স্বাধীন জীব।'

'হাঁস পুষতে তুমি অ্যালাউড নও, জানো?'

নিশিকান্ত তার ভিতরের পকেট থেকে পস্টিকের খামে ভাঁজ-করা চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বার করল সাবধানে। ইঁদুরের ভয়ে এটা সে ঘরের ভিতর রাখে না। সেটা একবার পড়ে ভোলাবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

'কই স্যার? এতে তো হাঁসের কথা নেই!'

ভোলা বোস প্রচণ্ড রেগে চলে গেলেন কলকাতা। নিজের লম্বা রিপোর্টে ফিল্ড-অফিসের কাজকর্মের ঢিমেতালা অবস্থার কথা তো লিখলেনই, তারপর নিশিকান্তকে নিয়ে চার প্যারাগ্রাফ। হেডিং-এ প্রথমে দিয়েছিলেন, ইংরেজিতে : 'নিশিকান্ত ডিলিং উইথ ডাক্স্।' তারপর বদলে : 'নিশিকান্ত ডাকিং হিজ ডিউটি।'

রিপোর্ট অবশ্য বাংলায়। তাতে অভিযোগ করা হয়েছে : একজন সিকিওরিটি গার্ড হাঁস পুষতে পারে কিনা, পুষলে তার কর্তব্য অবহেলা করা হয় কিনা এবং হাঁস পোষার খরচ কোম্পানির খাতে যাচ্ছে কিনা ইত্যাদি।

ব্যাপার খুব ঘোরালো হয়ে উঠল।

উইলিয়াম অ্যালবার্টসনের হেড অফিস থেকে নিশিকান্তকে শো-কজ করা হল। অর্থাৎ, দেওয়া হল কারণ দর্শানো নোটিশ। সেটা আবার ভীষণ প্যাঁচালো ইংরেজিতে। কারণ, কোম্পানির লিগ্যাল সেলের প্রভু চৌধুরী এইসব নোটিশ তৈরি করেন। একটু সরল করে বললে নোটিশটা এইরকম : 'এতদ্বারা আপনাকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে জানাতে বলা হচ্ছে যে, আপনার অন্যায়ভাবে দেওয়া অবৈধ আশ্রয়ে যে-সব প্রাণী উপরিউক্ত কোম্পানির প্ট নং ৫০৫, খাতা ২১৩/বি, মৌজা রঘুনাথপাড়া সংলগ্ন চিন্তামণিপুর, ব্লক তিলতলা, জেলা (ধ্যাবড়ানো) তে বাস করছেন, করেছেন বা করবেন, তাদের নাম, জন্মস্থান, উচ্চতা, ওজন ও জীবিকা ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ আপনি কেন দিতে বাধ্য নন...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

নোটিশ এলো রেজিস্ট্রি ডাকে, গালা দিয়ে সিল করা খামে। খুলে তো নিশিকান্তর মাথায় হাত! যেমন ইংরেজি ভাষা, তেমনি জ্যালজেলে কাগজ, তেমনই ধ্যাবড়া টাইপ। উত্তর দেবে কী, পড়াই তো যাচ্ছে না। কী হবে?

হরিরামই বুদ্ধি করে নোটিশটা নিয়ে ওদের গ্রামের মিডল স্কুলের হেডস্যারকে পড়িয়ে, আর বাংলার মাস্টারমশাইকে দিয়ে অনুবাদ করে আনল।

ভাবনা-চিন্তায় আধখানা হয়ে নিশিকান্ত খাওয়াদাওয়া ছেড়ে ততক্ষণ শুয়ে পড়েছে। কিন্তু হাঁসেরা তো ভাবনা-চিন্তার ব্যাপারটা বোঝেই না। তারা চ্যাঁচামেচি করে, কট্-কট্ করে ডানা খুলে ঝেড়ে, ঘরের বাইরে থেকে ডাকতে লাগল : 'নিশিকান্ত, ও নিশিকান্ত, রান্না ভাত দাও, খাবার দাও—'

তাদের চিৎকারে নিশিকান্তর ঘুমোনো তো অসম্ভব, কুকুর ভামরাও দূরে পালিয়ে বাঁচল।

কতক্ষণ আর শুয়ে থাকবে নিশিকান্ত। 'হাঁস-মুরগি পালন বৃত্তান্ত' বইটা যে তার মুখস্থ। তার একাদশ অধ্যায়ে আছে : 'গৃহপালিত হাঁসের মনোকষ্ট ও তাহার প্রতিকার'। রান্না ভাত গরম করে, তারপর ঠাণ্ডা করে চট্‌কে দিতেই হল হাঁসেদের। ততক্ষণে হরিরামও এসেছে। সে আজ বাড়ি যাবে না। দু'জনে নোটিশের উত্তর মুসাবিদা করবে।

'কী যে বিপদ হল আমাদের! বেশি লেখাপড়া জানি না দু'জনের কেউ...'

নিশিকান্ত একবার ভেবেছিল হাঁসেদের তাড়িয়ে দেবে, ছেড়ে দেবে চম্পি নদীর কাছে, অথবা হরিরামদের গ্রাম-ঘেঁষা শাল-জঙ্গলে। কিন্তু যেই সে মনে মনে ভাবে, কুকুর বা ভাম কামড়ে ধরেছে তার আদরের হাঁসেদের টুঁটি, অথবা হাঁসেরা রক্তমাখা পালক-ছেঁড়া অবস্থায় পড়ে আছে বালির উপর—অমনি শিউরে শিউরে ওঠে নিশিকান্ত। জবা যদি জানে, ভাববে, ইস্, এত লম্বা, এমন পালোয়ান আমার বাবা দুটো হাঁসকেও বাঁচাতে পারল না! কে-না জানে, বাচ্চারা সবসময় নিজের বাবা-মাকেই মনে করে সবচেয়ে শক্তিশালী আর বড়সড়! তাছাড়া বেচারি জবা জানেও না—তার বাবা বিরাট মাঠের মধ্যে ছোট্ট একটা ঘরে একা থাকে, আর তাকে গালা দিয়ে শিলমোহর করা হিজিবিজি নোটিশ পড়তে হয়।

মাথা ঠাণ্ডা করে, বাজার থেকে কেনা দিস্তে কাগজে, হরিরামের সঙ্গে পরামর্শ করে, নিশিকান্ত তার ক্লাস এইট পড়া বিদ্যে দিয়ে একটা দরখাস্ত লিখে ফেলল বাংলায়—সেটা হল ইংরেজি নোটিশের উত্তর। হাঁসের জন্মতারিখ সে পোস্টকার্ডে আনিয়েছে কালচিনি থেকে। ১৪১০ বঙ্গাব্দের মহালয়ার দিন জন্ম হাঁসেদের। হরিরাম দু'জনকে বাজারে নিয়ে ওজনও করিয়ে এনেছে, ওজনপাল্লায়। হাঁসেদের চিৎকারে মুদির অর্ধেক খদ্দের সেদিন হাওয়া। হাঁসেদের নামও রেখেছে—আক্‌শি আর ঝাপ্পু। নামটা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রাখা হয়নি, এটাও জানিয়েছে সবিনয়ে। জবার দেওয়া দায়িত্বই যে সে পালন করছে, এটা বোঝাতে চেষ্টা করেছে নিশিকান্ত। এরপর রঘুনাথপাড়া পোস্ট অফিস থেকে আবার রেজিস্ট্রি করে হেড অফিসে পাঠানো।

চিঠি খুলেই লিগ্যাল সেলের প্রভু চৌধুরী মুখ ব্যাজার করলেন। 'রিটন ইন বেংগালি'—অর্থাৎ, বাংলায় লেখা। চিঠিটা পাঠানো হল অনুবাদকের টেবিলে। অনুবাদক অনুভব কর্মকার তাতে '৩১৪৫' মার্কা দিয়ে, পাঠালেন ডায়ারি সেকশনে। অনুবাদের জন্য তাঁর কাছে ৩১৪৪টা আরও কাগজপত্র।

অনুবাদ হতে হতে দু'বছর ঘুরে গেল। এই দু'বছরে হাঁসেরা আরও বড়, মোটাসোটা হয়েছে, আর নিশিকান্ত রোগা। দুশ্চিন্তায় তার দিনের ঘণ্টা চারেকের ঘুমও উবে গেছে। তবে সে বুঝেছে, বাংলায় উত্তর দিয়ে বেশ বুদ্ধির কাজ হয়েছে, ইংরেজিতে দিলে এতদিনে নিশিকান্ত ও হাঁস দু'দলেরই মুণ্ডু কাটা পড়ত। সবচেয়ে খুশি নিশিকান্ত জবার কাছে দু'-দু'বার হাঁসেদের ফোটো, তাদের ছানাপোনাদের ফোটোও দিতে পেরে।

'তুমি এত রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন বারা?'

নিশিকান্ত উত্তরে কেবল জবার ঝাঁকড়া চুলে বিলি কাটে আর মিটিমিটি হাসে।

এরমধ্যে, দু'বছরে মিস্তিরিরা তাদের রথ, গাজন, সংক্রান্তি, ঈদ, দুর্গাপুজো, মহরম, বড়দিন সব সামলে কোম্পানির বাড়িটা তুলে ফেলেছে। ছোট্ট কারখানা-শেড দুটো, আর দোতলা অফিসবাড়ি। তাই সই। খুব জোরকদমে কাজ হচ্ছে। প্লাস্টার, লাইটের তার টানা, মার্বেল বসানো—ধুলোবালি, লরির শব্দ, মানুষের দাপাদাপিতে হাঁসেদের চিৎকার মিশে সে এক কাণ্ড!

উনিশে মে নতুন বাড়ির উদ্বোধন হবে। হেড অফিসে শোরগোল। উইলিয়াম অ্যালবার্টসন কোম্পানির আদি প্রতিষ্ঠাতা ইংল্যান্ডের মিডলসেক্স-এর স্যার জন উইলিয়াম-এর নাতনি মেমসাহেব মার্থা এসেছেন কলকাতায়। ঠিক হয়েছে তাঁকে দিয়েই নতুন বাড়ি উদ্বোধন করানো হবে। এই গণ্ডগোলে কখন-যে অনুভব কর্মকার নিশিকান্তর দরখাস্ত অনুবাদ করে প্রভু চৌধুরীর টেবিলে দিয়েছে, তিনি খেয়ালই করেননি।

নির্দিষ্ট দিনে মস্ত গাড়ি করে মেমসাহেব এলেন বাড়ি উদ্বোধন করতে। এয়ার কন্ডিশন্‌ড্ গাড়ি, কিন্তু পথে দু'বার টায়ার পাংচার হয়েছে। তাতে কী? মেমসাহেবের প্রথম ভারত সফর। যা দেখেন, তাতেই বলেন, 'হাউ সুইট! ওয়ান্ডারফুল!'

উইলিয়াম অ্যালবার্টসন কোম্পানির পুরো অফিস চিন্তামণিপুরে নেমে এসেছে। ম্যানেজিং ডায়রেক্টর, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, প্রভু চৌধুরী (লিগ্যাল সেল ইনচার্জ), অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ভোলা বোস। আজকে পাহারা চৌকিদারি সব মাথায় উঠেছে। রঘুনাথপাড়া থেকে নাচের দল এসেছে ধামসা-মাদল নিয়ে। বিস্কুটের কারখানার

লোকেরা সবাইকে বিনা পয়সায় বিস্কুট খাওয়াচ্ছে! হরিরাম আর নিশিকান্তর তো এক মিনিট ফুরসত নেই। তারা কাগজের মালা বানিয়ে ময়দার আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়ালে লাগাচ্ছে, গাঁদাফুল দেবদারু পাতা দিয়ে গেট সাজাচ্ছে। এরই মধ্যে সাঁ-সাঁ করে গাড়ি, আগে আগে কোম্পানির জিপ যে কখন সবুজ গেটে এসে পৌঁছেচে, নিশিকান্ত টেরই পায়নি।

গাড়ি থেকে নেমেই মেমসাহেব অবাক! কী কাণ্ড! দুটো মস্ত হাঁস—ধবধবে সাদা—আগে আগে, আর সঙ্গে দশটা ছোট-বড় বাচ্চা-হাঁস—হেলে-দুলে এগিয়ে আসছে।

আহা! পিছনে আকাশি-নীল বর্ডার দেওয়া সাদা বাড়ি, সামনে সাদা হাঁসেরা, আরও পিছনে গ্রীষ্মের ঝকঝকে নীল আকাশ—'হাউ ওয়ান্ডারফুল!'

'আহা!' মেমসাহেব মার্থা রুমালে ফর্সা মুখ মুছে বললেন, 'কী অপূর্ব আইডিয়া! আপনারা হাঁস রেখেছেন! আহা! আমার নরফোকের লেক রীজন-এর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—সেই রীড্‌স্, সেই হাঁস, নীল জল...'

আর দেখে কে!

জিপ থেকে নেমে ভোলা বোস বেল্ট টানাটানি করতে করতে বললেন, 'অ্যাক্‌চুয়ালি, ইটস্ মাই আইডিয়া ম্যাডাম!'

প্রভু চৌধুরী ভীষণ রেগে জীবনে প্রথম বাংলায় বলে উঠলেন, 'কী আপনার! কক্ষনো না। মা জননী, এটা পুরোই আমর নিজস্ব ভাবনা!'

হাঁসেরা ভয়ানক চিৎকার করতে লাগল।

মার্থা বললেন, 'আরে, এরা তো বাংলা বলছে! কী বলছে এরা!'

ডেপুটি জি এম একটু কেশে বললেন, 'এরা 'থ্যাঙ্ক য়ু' বলছে আপনাকে ম্যাডাম।'

নিশিকান্ত একটা টুলে চড়ে কাগজের নিশান লাগাচ্ছিল। সেখান থেকে গেটের কাছে কোম্পানির সাহেব, হাঁস সব একসঙ্গে ঝাপসা দেখতে পেয়ে, ভয়ে সে প্রায় অজ্ঞান।

এমন সময় একটা রিনরিনে গলা চেঁচিয়ে উঠল, 'সব বাজে কথা! এরা সব আমার বাবার পোষা হাঁস। কোম্পানির সায়েবরা মেরেই ফেলছিল হাঁসেদের বাবা-মাকে একটু হলে!'

মার্থা মুখ লাল করে বললেন, 'শিশুরা সত্যবাদী হয়। ও কী বলছে, অনুবাদ করে বলো আমায়! এক্ষুনি!'

অনুভব কর্মকার একটু পিছনে ছিল। গত দু'বছরে ৩১৪৫টা অনুবাদ করে তার বেশ স্পিড বেড়েছে। গড়গড় করে বাংলা থেকে ইংরেজি করে দিল সে।

বেচারা ভোলা বোস, প্রভু চৌধুরী!

ওঁরা তো জানেনই না—নিশিকান্তর জবা বলে দারুণ সাহসী একটা মেয়ে আছে। আর সে গরমের ছুটিতে বেড়াতে এসেছে বাবার কাছে!

অলঙ্করণ : সমীর সরকার

নবনীতা দেব সেন

হিং টিং ছট

বাপ রে বাপ! কী গরমটাই না পড়েছে! গনগনে রোদ্দুরে সারাটা শহর যেন তন্দুর উনুন হয়ে রয়েছে, যাকে পাচ্ছে তাকেই ঝলসে কাবাব বানাচ্ছে! আমি বাবা গুটিশুটি ঘরের মধ্যে বসে আছি। পাখা চালিয়ে, দোর-জানলা বন্ধ করে। ঘরটা অন্ধকার হলে একটু যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে।

হঠাৎ বাবুসোনার আবির্ভাব।

'দিদিভাই, দ্যাখো দ্যাখো, কী পেয়েছি!'

বাবুসোনার চোখ চক্‌চক্ করছে। দু'-হাতের ছোট অঞ্জলিতে কী যেন ধরা।

'কী পেলি আবার?'

বাবুসোনা সারাক্ষণই রাস্তায় এটা-ওটা কুড়িয়ে পায়, আর তাই দিয়ে—অবন ঠাকুর যেমন কাটুম-কুটুম বানাতেন—ও তেমনি ছোট ছোট জিনিস তৈরি করে। দুর্গাপুজোর পরে পুজোপ্যান্ডেলে পড়ে-থাকা ভাঙা টুনিবাল্‌ভের প্লাস্টিকের ঢাকনি দিয়ে কী সুন্দর খেলনার ঘণ্টা বানিয়েছে!

এবার কী পেল কে জানে! দেখি, দেখি?

'ও মা! এ-যে আম রে! কোথায় পেলি, এত সুন্দর সুন্দর আম?'

'ওই তো, ওই দিদাদের বাগানে।' বাবুসোনা সগর্বে উত্তর দেয়, 'প্রচুর আম, মাঠ ভর্তি, তুমিও কুড়োতে পারো। শুধু গাছে ওঠা বারণ। আর গেট খুলে রাখা বারণ। দিদা খুব ভালো।'

'জানলি কী করে ও-বাড়িতে আম পড়েছে?'

'রাস্তায় খেলছিলাম। ওদের বাগানে বলটা পড়ে গেল, আনতে ঢুকেছি, দেখি, ই—শ্! বাগানভর্তি কত আম পড়ে আছে! কেউ কুড়োচ্ছে না। দিদা বারান্দায় বসেছিলেন, জিজ্ঞেস করলাম—'

এই আমগুলোকে ফুটো করে চুষে চুষে রস খেতে হয়—মধুগুলগুলি আম। ছোট্ট, আর মিষ্টি।

বাবুসোনা আর আমি আম চুষছি—হঠাৎ আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল।

বাবাই আমাকে শিখিয়েছিলেন এমনি ফুটো করে চুষে আম খেতে। সারা গায়ে রস গড়িয়ে পড়তো আমাদের—আমার ফ্রকে, বাবার সাদা ফতুয়াতে। মা এসে আমাদের বকুনি দিয়ে জামা পাল্টে দিতেন।

আমাদের ছোটবেলাতে হিন্দুস্থান পার্কের অনেকের বাড়িতে বাগান ছিল। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ফল পাড়তে যাওয়ার অভ্যেসও ছিল বাচ্চাদের। পেয়ারা, কুল, আম, জামরুল। বাগচীবাড়ির জামরুল গাছটা খুব উঁচু মতন ছিল, ওঠাই যেত না। পাশের পেয়ারা গাছে চড়ে, তবে ডালটার নাগাল পেতে হতো। তারপর সহজ। নামবার সময়ে ওদের ছাদে টুক করে লাফিয়ে পড়ো। আর সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে এসো। বাগচীবাড়ির ভালোনাম 'ইলাবাস'। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়ি ছিল সেটা। সেখানে আমাদের 'মণিমেলা'-ও ছিল।

ছোটবেলাতে (তখন আমি বাবুসোনার চেয়েও ছোট) একবার একদম বিনা কষ্টে গাছে না-চড়েই মাটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে ইয়া বড় বড় আম পেড়েছিলুম। সেই গল্পটা কিন্তু বাবুসোনার আম কুড়োনোর মতো এমন খুশির গল্প নয়।

সেবার আমি মা-বাবার সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিতে একটা খুব সুন্দর বাড়িতে গিয়ে ছিলুম। ছোট্ট, কালো রঙের একটা মাটির তৈরি কুটির, তাতে কোনও জানলা নেই। দেয়ালের গায়ে জানলার মতো বড় বড়, চৌকো চৌকো ফোকর আছে, গরাদ নেই, পাল্লাও নেই—খুশিমতো সেই ফোকর গলে যাতায়াত করা যায়।

বাড়ির পিছনে ছায়া-ঘেরা স্বপ্নের মতো সুন্দর একটা আমবাগান ছিল। তাতে বেঁটে বেঁটে আমগাছের নিচু নিচু ডালে কী চমৎকার বড় বড় সবুজ সবুজ আম ঝুলে আছে।

আমাদের হিন্দুস্থান পার্কের পাড়ার বাগানগুলোতে সব আমগাছেরাই খুব উঁচু উঁচু। বেশ কায়দা কসরৎ করে উঠতে হয়। তার ওপর কাঠপিঁপড়ের বাসা থাকে। কী বিষকামড়! আর এখানে? সহজ! ওই জানলার মতো ফোকর দিয়ে দিব্যি গলে বাগানে বেরুনো যায়।

মা ঘুমোচ্ছেন। ভীষণ গরম, আমি ওই ফোকর গলে বেরিয়ে আমবাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর মনের আনন্দে মাটি থেকেই হাত বাড়িয়ে গাছের আম ছুঁচ্ছি।

এমনি খেলতে খেলতেই দুটো বড় বড় দেখে আম পেড়ে নিয়েছি। পাড়া না, ছেঁড়া বলাই ভালো। হাতের কাছে ঝুলেছিল আমগুলো। মাটিতে দাঁড়িয়েই আম পাড়ছি—আহা, আমি যেন লিলিপুটের দেশে গালিভার!

খুব খুশি হয়ে ফের জানলা গলে ঘরে এসে মাকে ডেকে তুলে দেখালুম, 'মা, দ্যাখো দ্যাখো, কী পেয়েছি!'

মা দেখে কোথায় খুশি হবেন, তা নয়, মার ফর্সা মুখখানা লাল টুকটুকে হয়ে উঠল! এটা হলেই গোলমাল, মা তার মানে রেগে গেছেন।

না, এবারে রাগ নয়। মা লজ্জাতেই লাল হয়ে গেছেন। মেয়ের কুকীর্তিতে!

'ছি-ছি, তুই এটা কী করলি? বাগান থেকে আম পাড়লি? অন্যের বাগানে না-বলে গাছে হাত দিতে হয় না, জানো না? ছি-ছি—প্রতিমা বউঠানকে কী করে জানাব? কী লজ্জার কথা—'

মা তো লোভী মেয়ের কুকর্মে লজ্জায় অধোবদন। কিন্তু বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, দুটো আম বই তো নয়? ওকে আগে আমাদেরই উচিত ছিল বারণ করে দেওয়া। ছোটরা তো এমন হাতের কাছে, অত নীচে আম দেখলে পেড়ে ফেলবেই! আমারই ইচ্ছে করছে!'

বাবা অবশ্য ছ'-ফুট লম্বা। বেঁটে বেঁটে আমগাছের বিশেষ আকর্ষণটি শুধু আমাদেরই!

ওই কালো মাটির বাড়িটার নাম 'শ্যামলী'। বাড়িটা শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের 'উত্তরায়ণ' বাড়ির আঙিনার মধ্যে। তার পিছনের বেঁটে আমগাছগুলো কিছু এখনও আছে। আমি কিন্তু আগেই বারণ করে দিচ্ছি—গাছের আমে যেন হাত দিও না কেউ!

বাবুসোনাকে তো নিষেধ করতেই হবে। ও-বাড়ির দিদার প্রশ্রয় পেয়ে সে দিনে তিন-চারবার ছুটে ছুটে যাচ্ছে, আর আম কুড়িয়ে আনছে। দিদাও বাধা দিচ্ছেন না।

আমবাগানটা আর থাকবে না শুনলুম। মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাটবাড়ি উঠবে ওখানে।

বাবুসোনাকে খবরটা বলিনি।

নামাঙ্কন : দেবাশিস দেব। অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ছবির মজা

অমল চক্রবর্তী

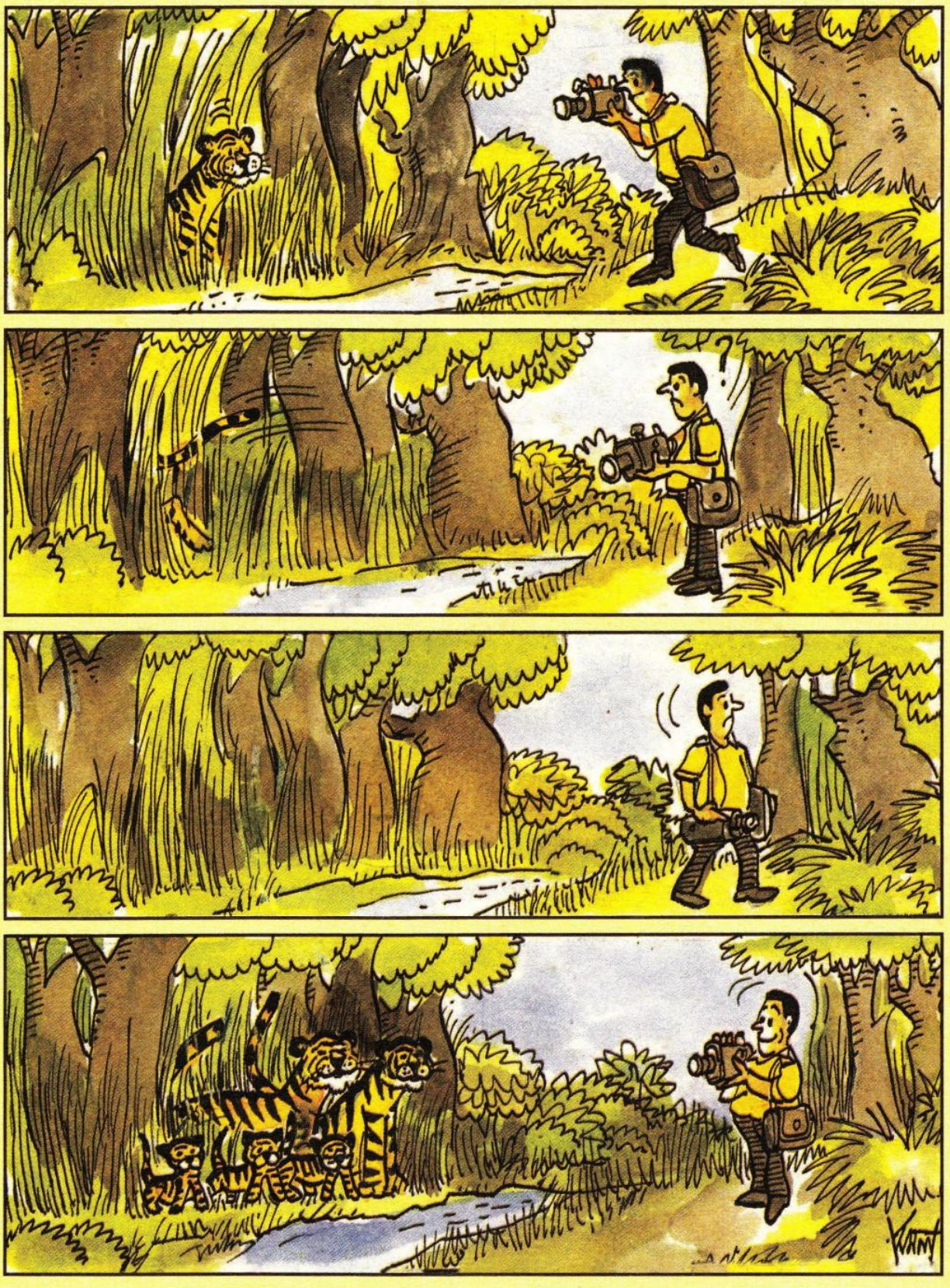

বই চেনা

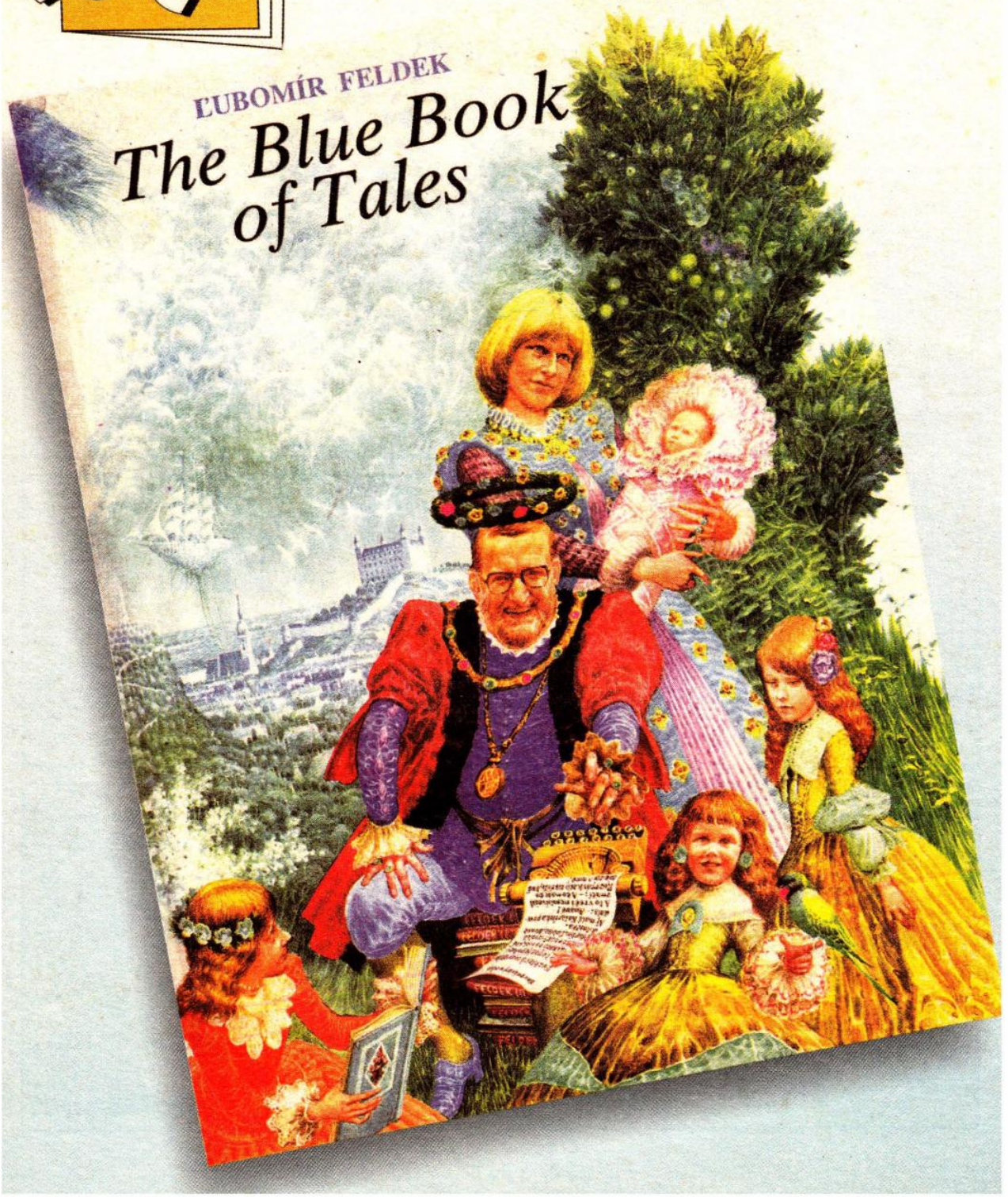

বৈশাখে পিয়ের গ্রিপারির লেখা যে ফরাসি বইটাকে চিনেছিলে, সে-বইয়ের একটা সেরা গল্প এবারে পড়ছ : 'মুফতার রোডের ডাইনি'। ঠিক তেমনি এবারে লুবোমির ফেলদেক্-এর লেখা স্লোভাক ভাষার যে-বইটাকে চিনলে, তার একটা দারুণ গল্প পড়তে পাবে আষাঢ়ে!

গল্পের নীল বই

শোভন সোম

দ্য ব্লু বুক অব্ টেল্স। লুবোমির ফেলদেক্
প্রচ্ছদপট ও অলঙ্করণ : আলবিন ব্রুনোভ্স্কি
স্লোভাক থেকে ইংরিজি ভাষান্তর : হিদার ত্রেবাতিচ্কা
স্লাদে লেতা পাবলিশার্স। ব্রাতিস্লাভা, স্লোভাকিয়া। ৩৯ স্লোভাক করুনা

নতুন দেশে অচেনা মানুষের দেখা মেলে। বেড়াবার জায়গাগুলোও দেখা হয়। কিন্তু নতুন দেশকে ভেতর থেকে দেখবার জন্যে যেতে হয় বইয়ের দোকানে আর গানের দোকানে। সাবেক চেকোস্লোভাকিয়া ভেঙে হয়েছে দুটো দেশ, চেকিয়া আর স্লোভাকিয়া। আমি গেছি স্লোভাকিয়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে। অজস্র পাহাড় আর পাহাড়ি দূর্গ, পাহাড়ি নদী আর অরণ্যে ভরা স্লোভাকিয়া ছবির মতো সুন্দর। রাজধানী ব্রাতিস্লাভা-ই এককালে অস্ট্রো-হাংগেরিয়ান সাম্রাজ্যের রাজনীতির কেন্দ্র, দাপুটে রানি মারিয়া তেরেসার রাজধানী প্রেস্বুর্গ নামে পরিচিত ছিল। ব্রাতিস্লাভাকে ছুঁয়ে বয়ে গেছে নীল দুনাই বা ড্যানিয়ুর নদী। এ-দেশ আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অর্ধেক। এ-দেশের লোকসংখ্যা কলকাতার চেয়েও কম, প্রায় ৪০ লাখ। হলে কী হবে, গোটা দেশটা শিক্ষিত আর পড়ুয়ার দেশ। তাই ও-দেশে অজস্র বই বেরোয়।

সেদিন ৬ ডিসেম্বর, সন্ত নিকোলাস দিবস। সিটি স্কোয়্যারে বিকেলে বাচ্চারা অভিনয় করল। বাচ্চাদের বেলুন ও চকোলেট উপহার দেওয়া হল। ওইদিন নাকি সন্ত নিকোলাস কারও ইচ্ছে অপূর্ণ রাখেন না। ওই উৎসব থেকে ফেরার পথেই দেখি—কী আশ্চর্য—একটা গানের দোকান আর একটা বইয়ের দোকান মুখোমুখি! গানের দোকানে ডিস্ক কিনে বইয়ের দোকানে ঢুকে দেখি—থরে থরে স্লোভাক, জর্মন আর রুশভাষার বই সাজানো। এমনকী স্লোভাকে অনূদিত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'-ও আছে, কিন্তু নেই কোনও স্লোভাক ভাষা থেকে অনূদিত ইংরিজি বই। ইংরিজি-পড়ুয়া ও-দেশে কত আছে, কে জানে! কিন্তু আমার তো স্লোভাক জানা নেই, আমাকে পড়তে হবে স্লোভাক থেকে ইংরিজিতে অনূদিত বই।

আমার দোভাষি মার্তা হেরুচোভা বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটির পর আবিষ্কার করলেন একটা বড় মাপের বই—লেখক লুবোমির ফেলদেক্—বইয়ের ইংরিজি নাম 'দ্য ব্লু বুক অব্ টেল্স', মূল স্লোভাক থেকে অনূদিত।

ইনি কেবল ছোটদের জন্য লেখেন। এ এক আশ্চর্য বই। তেমনি অবাক-করা ছবি। এঁকেছেন ও-দেশের বিখ্যাত চিত্রকর আলবিন ব্রুনোভ্স্কি। লেখক-শিল্পীর এমন রাজযোটক দেখে আমি অভিভূত। দোকানে দাঁড়িয়েই ভূমিকাটা পড়ে ফেললাম। বিভিন্ন মাপের হরফে বিভিন্ন বিন্যাসে ছাপা সেই ভূমিকাটাই একটা গল্প। সেটা এ-রকম—

ভূমিকার
গল্প, কেন
এ-বইয়ের নাম
গল্পের নীল বই

এক যে ছিল খোকা, সে একদিন একটা স্বপ্ন দেখল :

এক যে ছিল ফুলদানি।
ফুলদানিতে ছিল এক কন্যে।
কন্যের মাথায় একটি বারান্দা।
আর ওই বারান্দায় দাঁড়ানো একটা ফুল।

সকালে ছেলেটির ঘুম ভাঙল, সে তাকাল
জানালা দিয়ে আর ভুলে গেল স্বপ্নটা।
'কী স্বপ্ন দেখলি?' মা ওকে জিগ্‌গেশ করলেন।
আর ছেলেটি বলল,

'এক যে ছিল বারান্দা।
বারান্দায় দাঁড়ানো ছিল একটা ফুল।
ফুলটি ধরেছিল একটি ফুলদানি।
আর ফুলদানিতে ছিল এক কন্যে।'

'চমৎকার!' মা বললেন। উনি তাকালেন
জানালা দিয়ে আর ভুলে গেলেন স্বপ্নটা।
'ও কী স্বপ্ন দেখল?' বাবা মাকে জিগ্‌গেশ করলেন।
আর মা বললেন,

‘এক যে ছিল ফুলদানি।
ফুলদানিতে ছিল একটা ফুল।
ফুলের ওপর ছিল একটা বারান্দা।
আর বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল এক কন্যে।’

‘বেশ মজার তো!’ বাবা বললেন, ‘ওর থেকে
একটা ছোট্ট গল্প হতে পারে। খালি একটু ঘষামাজা দরকার। এই
একটুখানি।’

উনি টেবিলে লিখতে বসলেন। আর যেহেতু উনি একজন
অসাধারণ লেখক,
উনি সহজেই ওটাকে লিখে দাঁড় করালেন।

এক যে ছিল বারান্দা।
বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল এক কন্যে।
কন্যে ধরেছিল একটা ফুলদানি।
আর ফুলদানিতে ছিল একটা ফুল।

গল্পটা বেরোলো একটা পত্রিকায়,
তারপর গেল বইতে আর হল বিখ্যাত। ওঁরা বললেন, ‘এই গল্প
আমাদের শিশুসাহিত্যের ধ্রুপদী পরম্পরার সম্পদ।’
আর ওঁরা সেটাকে ইশকুল-পাঠ্য করলেন।
খোকা ইশকুলে গেলে ওকে হোম-ওয়ার্কে গল্পটা
মুখস্থ করতে বলা হল।
কিন্তু ও ভুল শিখল আর যখন মুখস্থ বলতে বলা হল,
সে তখন বলল,

‘এক যে ছিল ফুলদানি
ফুলদানিতে ছিল এক কন্যে
কন্যের মাথায় একটি বারান্দা
আর ওই বারান্দায় দাঁড়ানো একটা ফুল।’

‘তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।’ দিদিমণি বললেন।
‘এমন একজন বিখ্যাত মানুষ, গল্পের সবুজ বই-এর লেখকের
ছেলে, সে কিনা নিজের বাবার লেখা মুখস্থ বলতে পারে না!’
আর দিদিমণি ওকে দিলেন গোল্লা।
হয়তো তোমরা ভাবছ, ওই খোকার বাবা,
সেই বিখ্যাত মানুষ, গল্পের সবুজ বই-এর লেখক আমি।
বেশ, যাতে তোমরা আমাদের দু’জনকে গুলিয়ে না-ফ্যালো, তাই
আমি ভেবেছি এক্কেবারে আলাদা হব।
উনি ওঁর বইয়ের নাম দিয়েছিলেন গল্পের সবুজ বই,
আর আমার বইয়ের নাম হবে গল্পের নীল বই।

এই ভূমিকায় লেখক জানিয়ে দিলেন, ছোটদের ভাবনায় অসম্ভব বলে কিছু নেই, কিন্তু বড়দের ভাবনায় অসম্ভবের জায়গা নেই। তোমরা লক্ষ্য করেছ বোধহয়—খোকার অসম্ভব ভানাটাকেই গুছিয়ে নিয়ে লেখক-বাবা একটা সম্ভবপর ঘটনা তৈরি করেছিলেন। ইশকুলে বাবার ভাবনাটাই খোকাকে মুখস্থ করতে বলা হয়েছিল। কারণ, ইশকুলের পাঠ্যবইতে যা থাকে, তা ছোটদের ভাবনা নয়, বড়দের ভাবনা। আর সেটাই ছোটদের মুখস্থ করতে হয়। খোকা যখন ওর স্বপ্নের দেখাটা বলল, তখন সেটা ইশকুলের বইতে ছাপা বাবার ভাবনার সঙ্গে মিলল না বলে দিদিমণি ওকে দিলেন গোল্লা।

ফেলদেকের গল্পে থেকে থেকে ওঁর বাড়ির লোকজন পশু-পাখি ঢুকে গেছে, আর তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন নানা অসম্ভবের দেশে। যেমন ধরো, ওঁর কুকুর অ্যাকিলেসের গল্পটার কথা। পশু-পাখির গল্পগুলো উনি লিখেছিলেন একটা ছোট্ট কুটিরে বসে, টাইপমেশিনে। ওই কুটিরটাতে ওঁর সঙ্গে তখন ছিলেন ওঁর স্ত্রী ওল্‌গা, আর ছিল ওঁর পাহারাদার কুকুর অ্যাকিলেস। পোস্টম্যান চিঠি দিয়ে গেলে অ্যাকিলেস প্রথমে সেটা খুলে পড়ত। চিঠিতে কোনও খারাপ খবর না-থাকলে, ও চিঠিটা ফেলদেক্‌কে দিত। আর খারাপ খবর থাকলে, চিঠিটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলত। খারাপ খবর খেয়ে ওর কিছু হত না, আর লেখকও কোনও খারাপ খবর পেতেন না। লেখকের বন্ধু পাবলো পিকাসো কখনও দেখা করতে আসতেন। যখন ফেলদেক্‌রা বাইরে যেতেন, তখন পিকাসো এলে চিরকুটে একটা পাখি এঁকে ডাকবাক্সে ফেলে যেতেন—যাতে ফেলদেক্ বুঝতে পারেন যে, কে এসেছিলেন। অ্যাকিলেস ডাকবাক্স খুলে সেটা দেখত। পিকাসোর আঁকা ভালো হলে অ্যাকিলেস সেটা টেবিলে এনে রাখত। আর পিকাসো যদি ভালোভাবে পাখি না-আঁকতেন, তাহলে অ্যাকিলেস ওটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলত। কারণ, বিচ্ছিরিভাবে আঁকা পাখি খেয়েও ওর শরীর খারাপ হত না।... এই দ্যাখো, গল্পটা প্রায় বলেই ফেলেছিলাম। তবে আসল মজাটা তো বলিনি। সেটা না-হয় মুলতুবি থাক।

এই নীল বইয়ের একটা উপসংহার বা শেষের কথাও আছে। সেটা এই—

উপসংহার

যখন আমার পাঠকরা জানতে চান আমার সেরা বই কোনটি, আমি বলি হু গল্পের নীল বই। এটুকু বলে আমি যোগ করি : কারণ আলবিন ব্রুনোভ্স্কি এটার ছবিগুলো এত সুন্দর এঁকেছেন। অনেকে এ-ও ভাবতে পারেন যে, আমি এমন ধারণা দিতে চাই—আমি বিনয়ী বলে নিজের সফলতার কথা বলতে চাই না, যদিও ওঁরা ভেতরে ভেতরে এ-ও জানেন যে, গল্পের নীল বই-এর জনপ্রিয়তা কেবল ছবিগুলোর জন্যে নয়।

কী জানি বাপু। হয়তো এমন কথা আমি ভেতর থেকেই বলি। সময় সময় অমনটাই হয়। তাহলে, আমার সবচেয়ে সেরা বই কোনটি? গল্পের নীল বই।

আচ্ছা, কেন বলুন তো?

কারণ আলবিন ব্রুনোভ্স্কি ওর জন্যে এই সুন্দর ছবিগুলো এঁকেছেন।

কোনও লেখক তাঁর বইয়ের আঁকিয়েকে এ-ভাবে ধন্যবাদ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। লেখা ভালো হলেই কি হয়? ভালো লেখা চায় ভালো ছবির জুটি, যা কল্পনাকে আরও উস্‌কে দেবে।

এই বই পড়ে আমি লেখক আর আঁকিয়ে—দু'জনের সঙ্গেই যোগাযোগ করি। ওঁরা দু'জনেই অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। আলবিন ব্রুনোভ্স্কি থাকেন পাহাড়ের ওপর খুব পুরনো একটা বাড়িতে। ওঁর সঙ্গে একটা সন্ধ্যে কাটিয়েছি। লুবোমির ফেলদেক্ যখন দেখা করবার ফুরসত পেলেন, তখন আমার অধ্যাপনার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। ওঁর সঙ্গে দেখা হল না, এই যা দুঃখ।

তবে দেখা যে পাইনি, তাই-বা কী করে বলি! বলেছি তো, একটা দেশকে দেখতে হলে তার গানের আর বইয়ের দোকানে যেতেই হয়! বইয়ের দোকনে না-গেলে কি লুবোমির ফেলদেক্ নামক এই আশ্চর্য এক লেখককে চিনতাম, তাঁর বই কিনতাম, আর তোমাদের এ-বইটার গল্প বলতে পারতাম?

এ-বই সন্ত নিকোলাস দিবসের আবিষ্কার।

হাত পাকাবার

সোহিনী আচার্য গ্রাহক সংখ্যা ৪২৩৫। বয়স ৭ বছর

সাগর ঘোষ
গ্রাহক সংখ্যা ৪২২১। বয়স ৯ বছর

আসর

নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়

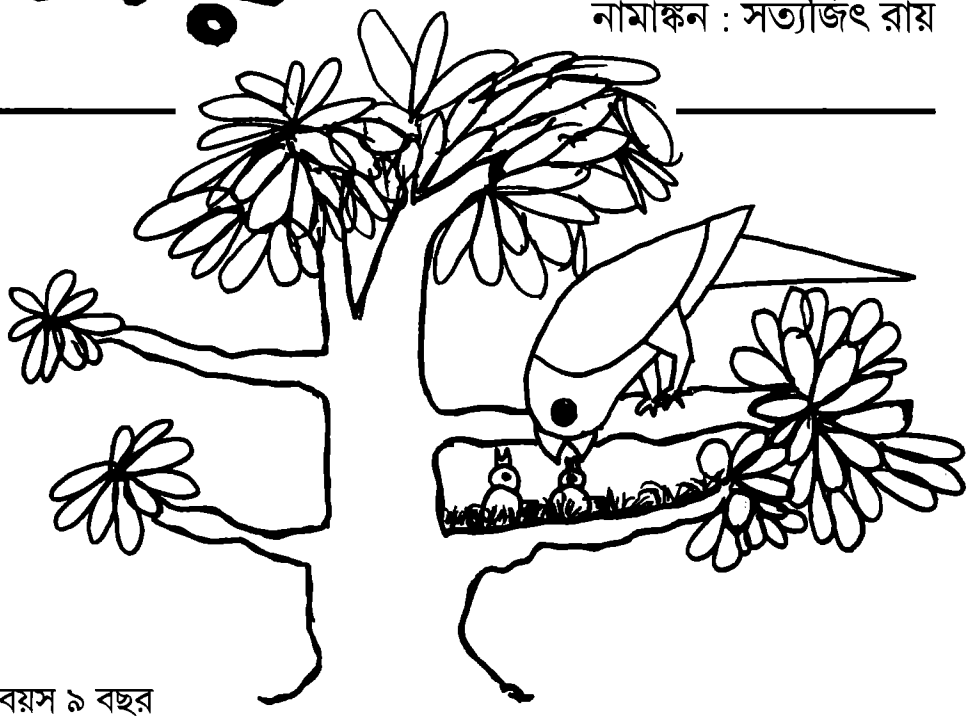

সৃজনী দাশমুন্সী
গ্রাহক সংখ্যা ৩৩৫৬। বয়স ৯ বছর

রৌদ্র মিত্র
গ্রাহক সংখ্যা ৪৭৩৪
বয়স ১৬ বছর

দীপ মুখোপাধ্যায়

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

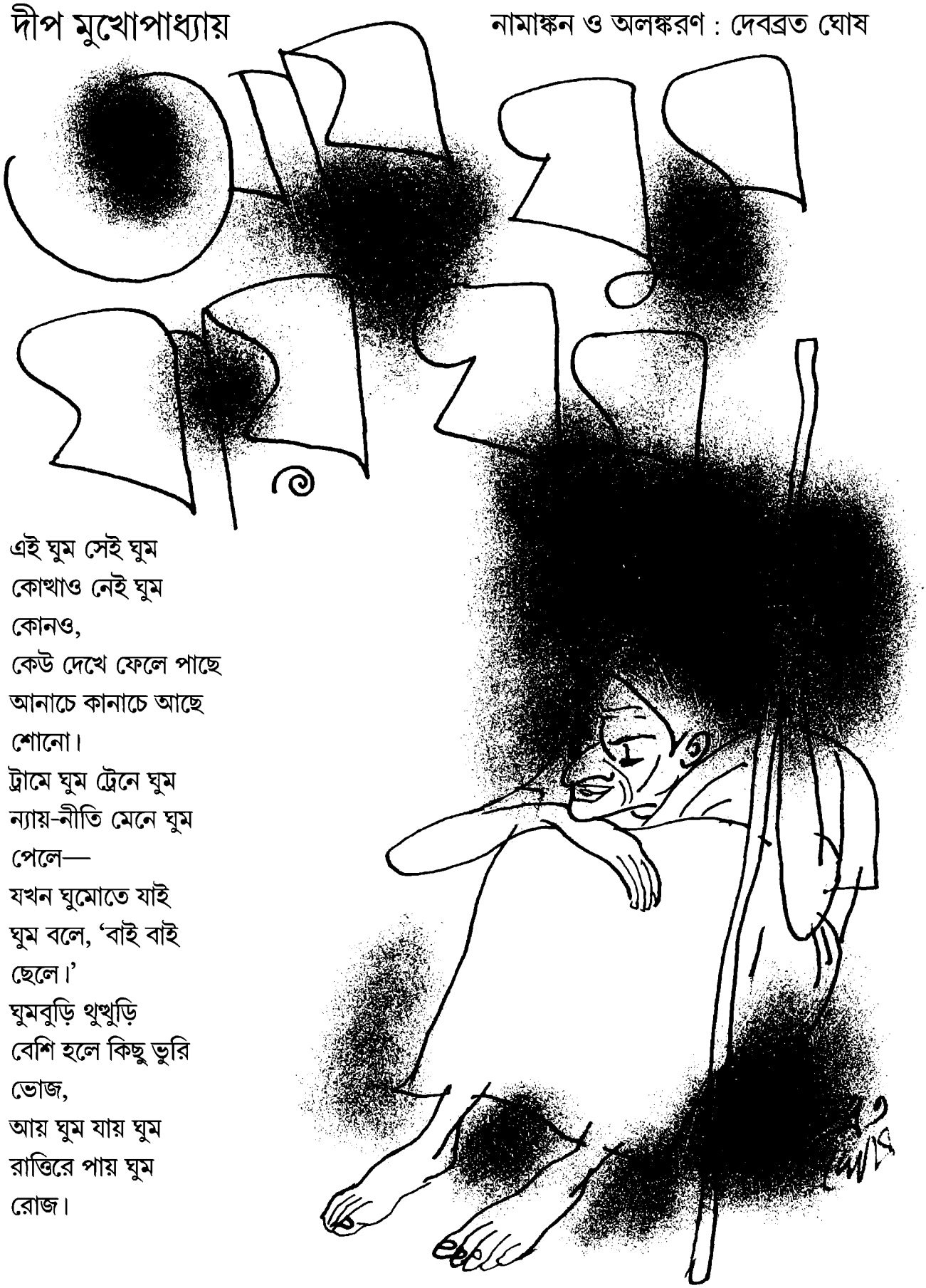

এই ঘুম সেই ঘুম
কোত্থাও নেই ঘুম
কোনও,
কেউ দেখে ফেলে পাছে
আনাচে কানাচে আছে
শোনো।
ট্রামে ঘুম ট্রেনে ঘুম
ন্যায়-নীতি মেনে ঘুম
পেলে—
যখন ঘুমোতে যাই
ঘুম বলে, 'বাই বাই
ছেলে।'
ঘুমবুড়ি থুত্থুড়ি
বেশি হলে কিছু ভুরি
ভোজ,
আয় ঘুম যায় ঘুম
রাত্তিরে পায় ঘুম
রোজ।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সুকুমার রায়

সুবিনয় রায়

সত্যজিৎ রায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লীলা মজুমদার

নলিনী দাশ

বিজয়া রায়

এঁরা সবাই সন্দেশ-এর সম্পাদক

বাঙালির ছোটবেলা। চার পুরুষ ধরে।

সত্যজিৎ রায়

অমরত্বের মন্ত্র

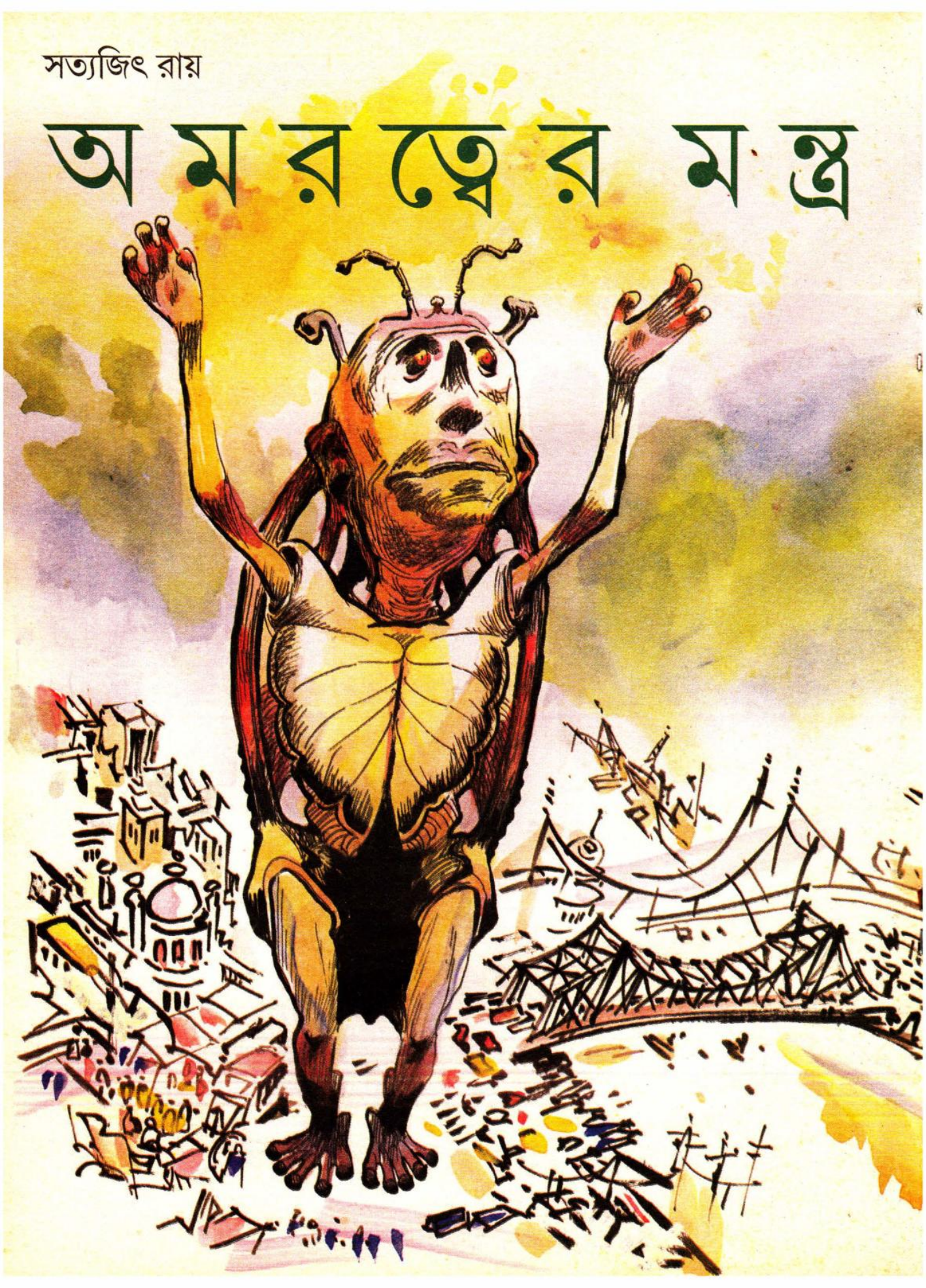

রাজভবন পেরিয়ে গরিং দক্ষিণমুখো চলল। মর্ত্যের শহর যেন ভীড়ে ফেটে পড়ছে। অলিম্পা গ্রহের প্রতিনিধি হয়ে এসেছে গরিং। বিনা যানবাহনে সে কলকাতায় এসে নেমেছে। নেমেই সে অবাক! তার কল্পনাতীত এই বিপুল জনতা! কিন্তু এতে তার একটুও ভয় নেই। কোনো গ্রহের কোনো প্রাণী তার সূক্ষ্ম অদৃশ্য দেহের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।

তবে ভাবনা আছে! অমরত্বের একমাত্র মন্ত্র তার কাছে। সেইটে সুপাত্রে দান করা চাই। কিন্তু এত প্রাণীর মধ্যে কাকে? এই ভীড়ে, এই বেনোজলের মধ্যে ভালো পাত্র কোনটি? গরিং মনে মনে ভাবল, তার ভাগ্যই খারাপ—নইলে এত গ্রহ থাকতে এমন নোংরা বিশ্রী গ্রহে তাকে পাঠায়?

বহু ঘুরে সন্ধ্যায় গরিং শান্ত মনে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল। সে জানে, মন্ত্র কাকে দেবে। মন্ত্রটা আকাশে ছড়িয়ে দিল।

যে পেল, তার নাম কলকাতা।

অলঙ্করণ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

চণ্ডী লাহিড়ি

লেখাপড়া কিছু নয়

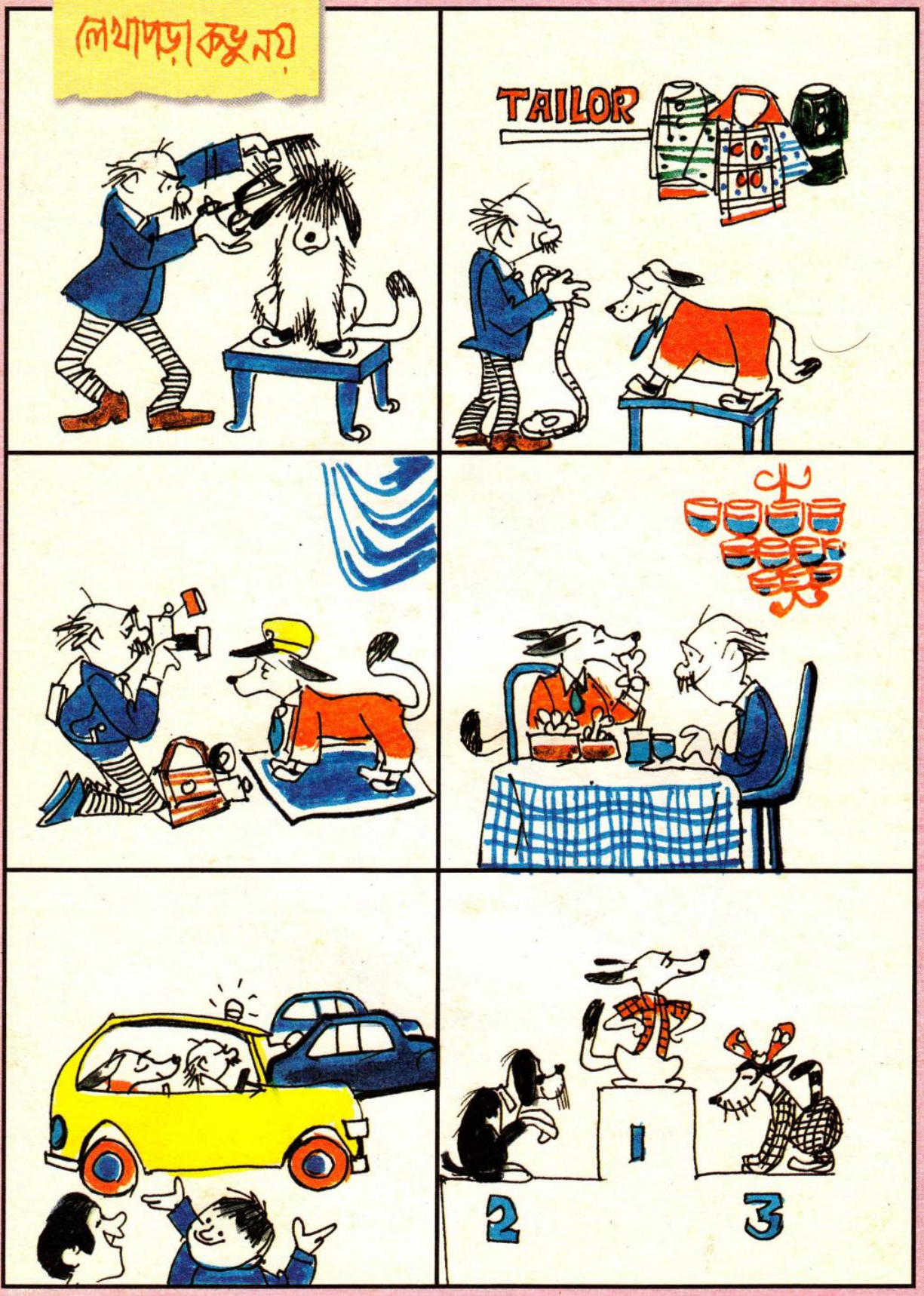

ENDURANCE TEST
ICE CREAM
SCHOOL

ছুঁচকাঁথার গল্প

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

পাশাপাশি দুই দেশ। একই নদী দু'-দেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। ডাঙায় যে-রকম কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে এক দেশ থেকে আর-এক দেশকে আলাদা করা হয়, নদীর ওপর তো সে-রকম বেড়া দেওয়া যায় না। জলের ওপর দাগ কাটাও অসম্ভব। ফলে কী হয়, এক দেশের জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে মাঝে-মাঝেই নৌকো নিয়ে অন্য দেশে ঢুকে পড়ে। নদীর মধ্যে ঠিক কোথায় এই দেশের শেষ আর ওই দেশের শুরু, তা কে তাদের বলে দেবে!

এ-বছর বর্ষাকালে যুধিষ্ঠির তার দুই ছেলেকে নিয়ে ইলিশমাছ ধরতে বেরিয়ে কখন-যে নদী বেয়ে নিজের দেশ পেরিয়ে অন্য দেশে ঢুকে পড়েছে, বুঝতে পারেনি।

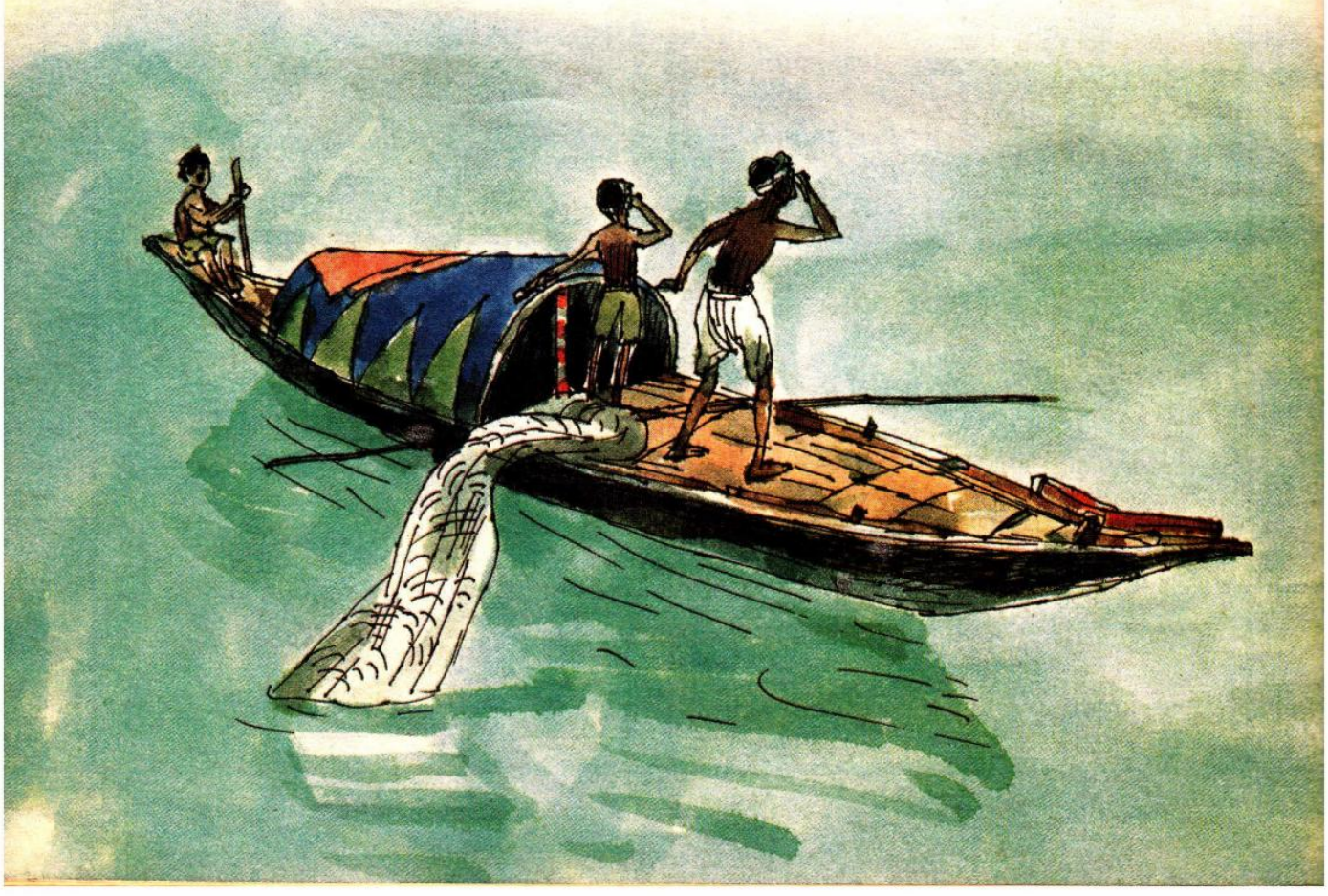

সারারাত জালে প্রচুর ইলিশ উঠতে দেখে ভোরের দিকে যুধিষ্ঠির ছেলেদের বলল, 'আজ আমাদের ভাগ্যটা কী ভালো দেখেছিস! যেখানেই জাল ফেলছি, ঝাঁক-ঝাঁক ইলিশ! মাছ তো নয়, যেন বস্তা বস্তা রুপোর টাকা উঠছে!'

ভাগ্যে ঠিক কী আছে, যুধিষ্ঠির তা টের পেল চারদিকে সকালের আলো পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়ার পর। তার নৌকোর সামনেই ভিনদেশি জলপুলিশের নৌকো! নৌকোটা আরও কাছে এলে একজন জলপুলিশ লাফিয়ে তার নৌকোয় উঠে পড়ল। তারপর নৌকোটাকে প্রায় টানতে টানতে তীরের দিকে নিয়ে চলল।

যুধিষ্ঠির আর তার দুই নাবালক ছেলেকে সারারাত হাজতে রেখে, পরদিন সকালে মাছ চুরির দায়ে তাদের আদালতে নিয়ে গেলে, সে-দেশের বিচারকমশাই যুধিষ্ঠিরকে এক বছরের জেল, আর দুই ছেলের বয়স কম বলে তাদের তিন মাসের জেল খাটবার হুকুম দিলেন।

আর সেই ইলিশগুলো? যেহেতু চুরি করে ধরা, তাই তাদের আবার নদীতে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ হল।

ইলিশমাছ একবার ডাঙায় উঠলে আর বাঁচে না—সে-কথা না বিচারক, না পুলিশ, কারও মনে পড়ল না।

যুধিষ্ঠির তার ছেলে-দুটোকে বড্ড ভালোবাসে। তারা যখন বিদ্যাধরীনদীর তীরে হেতাল-গরাণের হালকা ছায়ায়, তকতকে নিকোনো উঠোনে হামাগুড়ি দিত, তখনই তাদের মা এককোমর জলে চিংড়ির 'মীন' ধরতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে যায়। কুমির তার হাঁটু কামড়ে ধরে গভীর জলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেই কুমিরটাকে পরে আবার দেখা গেছে—নদীতীরে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে, কিন্তু তাদের মাকে আর-কোনওদিন কোথাও দেখতে পায়নি দুই ভাই।

ভিনদেশের জেলখানায় একদিকে যুধিষ্ঠির আর অন্যদিকে তার দুই ছেলেকে রাখার ব্যবস্থা হল। দুই ভাই প্রথম প্রথম ভয়ে চিৎকার করে কাঁদত, তারপর দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত, তারপর চুপ করে কখনও বসে থাকত আর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

ক্রমশ দুঃখ, ভয়, ক্লান্তি বেশ খানিকটা সয়ে গেল।

দু'-ভাই তিন বছর তাদের গ্রাম থেকে তিন গ্রাম দূরের স্কুলে পড়তে গিয়ে কয়েকটা ছড়া শিখেছিল, এখন জেলে বসে একজন আর-একজনকে দুলে দুলে ওইসব ছড়া শোনায়। বাঘ, কুমির, মাছ, মধু, নৌকো, নদী—এইসব নিয়ে গ্রামের কবিরাই ছড়াগুলো বানিয়েছে।

জেলখানায় তিন মাস শেষ হতেই, দুই ভাইকে বাইরে এনে দু'জন পুলিশ একটা রিকশায় তুলে দিয়ে রিকশাওলাকে বলল, 'সোজা নদীতীরে পা-ধোওন পানিঘাটে নিয়ে যা। শিরিষগাছের গুঁড়িতে তাদের নৌকোটা বাঁধা আছে। নৌকোর পিঠে আলকাতরায় ১১১ নম্বর লেখা। নৌকোয় উঠল কিনা স্বচক্ষে দেখে এসে, আমাকে থানায় রিপোর্ট করবি।'

শুনে দু'-ভাই একসঙ্গে কেঁদে ফেলে বলল, 'আমাদের বাবা কোথায়?'

দু'জন পুলিশের একজন পানের ডিবে থেকে একটা পান নিয়ে মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলল, 'তিনি আর নাই গো। তোমাগো দুঃখে তিনি চোখের জল ফ্যালতে ফ্যালতে প্রাণত্যাগ করসেন।'

শোকে-দুঃখে মুখে তার ছেলেবেলার গ্রামের ভাষা এসে গেছে। চোখ দুটোও জলে ভেজা। পানের পিক ফেলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে হল।

নৌকো চলেছে তো চলেইছে। বড়ভাই বসেছে হালে, ছোটভাই ধরেছে দাঁড়। বড়ভাই শক্ত মুঠোয় কব্জি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাল নাড়াচ্ছে, ছোটভাই জোরে জোরে দু'-হাতে দুই দাঁড় বইছে। প্রথম থেকেই মাথার ওপর একটা চিল যেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলেছে। চিল সাধারণত যে-রকম উঁচুতে ভেসে বেড়ায়, এটা তেমন নয়। বেশ অনেকটা নীচে, দু'-ভাইয়ের প্রায় মাথার ওপর, নৌকোর ঠিক সামনে উড়ে চলেছে।

বড়ভাই রোদে চোখ কুঁচকে চিলটাকে দেখতে দেখতে হঠাৎই বলে উঠল, 'কেতু, এ আমাদের বাবা নয় তো! হয়তো চিলের বেশে বাবাই আমাদের সঙ্গে দেশে ফিরছে! না-হলে মাছ ছোঁ-মারার সময় বাদে চিল কখনও এত নীচে নামে?'

ছোটভাই কেতু জোরে জোরে দাঁড় বাইতে বাইতে বলল, 'দাদা, দুঃখে তোর মাথার ঠিক নেই। মানুষ কখনও চিল হতে পারে?'

'মানুষের আত্মা পাখির মতো আকাশে উড়তে পারে না? বাবার আত্মা চিলের বেশে আমাদের কাছে কাছে থাকতে চাইছে রে!'

নৌকো কোনদিকে চলেছে কে জানে! বিদেশ শেষ হয়ে এতক্ষণে কি তারা দেশের নদীতে পড়েছে? নাকি এখনও বিদেশের নদীতেই আছে? এদিকটায়, এত দূরে তারা বাবার সঙ্গেও কোনওদিন আসেনি। এই নদী তাদের সম্পূর্ণ অচেনা।

দিন শেষ হয়ে আসছে। খিদেয় দু'-ভাইয়ের গা গোলাচ্ছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। শক্ত মুঠোয় হাল ধরে থাকা বা গায়ের জোরে দাঁড়-বাওয়া আর বুঝি পারে না। কাছে-দূরে আর-কোনও নৌকো বা ভুটভুটি বা লঞ্চও চোখে পড়ছে না। তবে কি আর-কোনও নতুন দেশে তারা ঢুকে পড়েছে! নদীও ক্রমশ আরও চওড়া, হয়তো আর-একটু পরেই সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে।

এই অবস্থায় হঠাৎ নদীর ওপর সন্ধ্যা নামল। যেন ছুঁড়ে দেওয়া হাতজালের মতোই জলের ওপর ছড়িয়ে পড়ল।

চিলটাকেও আর আকাশের কোথাও দেখা গেল না।

সেই পাতলা অন্ধকারে তাদের চোখে পড়ল—একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে দোতলা একটা জাহাজ। জাহাজের পাশ থেকে একটা ছিপনৌকো তীরের বেগে এসে তাদের গা-ঘেঁষে দাঁড়াল। সেই নৌকো থেকে একজন লোক মস্ত একটা ভারী নোঙর দু'-হাতে তুলে ছুঁড়ে দিল কেতুদের নৌকোয়।

আর-একটু হলেই সেই ঝাঁকুনিতে তাদের নৌকো উল্টে যেত।

ছিপনৌকো যেমন এসেছিল, তেমনই ফিরে চলল জাহাজটার দিকে। টেনে নিয়ে চলল দুই ভাইয়ের নৌকোটাকেও। তারপর দড়ির সিঁড়ি দিয়ে দু'-ভাইকে জোর করে তোলা হল জাহাজে।

জাহাজে প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন লোক। রঙিন াস্টিকের চেয়ারে বসে একজন লোক রিভলভারে গুলি ভরছিল, কেতুদের একবার দেখে নিয়েই বলল, 'এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?'

গলার সাংঘাতিক আওয়াজ শুনে বড়ভাই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললেও, ছোটভাই উত্তর দিল, 'যাচ্ছিলাম আমাদের দেশ, নিজেদের গাঁয়ে।'

'দেশের কী নাম? গ্রামের কী নাম? সেটা কোন দিকে?'

গলার আওয়াজে বড়ভাই এবারও কেঁপে উঠলেও, সে-ই যতটা সম্ভব স্পষ্ট গলায় উত্তর দিল, 'দেশের নাম

আমাদের দেশ। গাঁয়ের নাম ছেঁড়াকাঁথা। দিক তো বলতে পারব না বাবু।'

'হেঁয়ালি রাখ! মিথ্যে বললে—' বলে লোকটা রিভলভার তাক করল, 'সোজা কথা বল দেখি কোত্থেকে আসছিলি?'

দাদা কথায় কথায় চমকে উঠছে দেখে ছোটভাই শান্ত গলায় বলল, 'ইলিশ ধরতে বেরিয়ে নদীর ওপর দু'-দেশের ভাগরেখা বুঝতে না-পেরে, ভিনদেশে ঢুকে পড়েছিলাম। সেখানকার পুলিশ তিন মাস জেলে পুরে রেখে, আজই ছেড়ে দিল। সেখানে থেকেই আসছি।'

লোকটা এবার সঙ্গের একজনকে হুকুম দিল, 'দু'জনকে এখনই পেট ভরে থেকে দে। সারাদিন এদের পেটে কিছু পড়েনি।'

সঙ্গে সঙ্গে বিরিয়ানি, চাপ, কাবাব, বিঘৎ সাইজের ইলিশ ভাজা, ক্ষীর, সন্দেশ—বিরাট দুটো থালায় সাজিয়ে হাজির করা হল।

'খেয়ে নে। এবার থেকে রোজ দু'-বেলা এ-রকমই খাবি। তার ওপর ইলিশ ধরে যে-টাকা পাস, তার চেয়ে ঢের বেশি টাকাও পাবি।'

দু'জনে খাবারের সামনে বসে পড়েছে। খিদে আর একমুহূর্তও সহ্য হয় না। বড়ভাই সবে এক থাবা বিরিয়ানি মুখের কাছে তুলেছে, ছোটভাই জাহাজের লোকটাকে বলল, 'কেন এ-সব খাওয়াচ্ছেন? কেন এত টাকা দেবেন?'

'শুধু এ-দেশ থেকে নৌকোয় ও-দেশে কিছু জিনিস পৌঁছে দিবি। সপ্তায় দু'-তিনদিন মাত্র। ভুল পথে না, যাবি সোজা পথে। এই নদীতে দু'-দেশে যাতায়াতের এ-রকম সোজা রাস্তা অনেক আছে, একবার চিনিয়ে দিলে দেখবি আর ভুল হবে না।'

বড়ভাই দ্বিতীয় গ্রাস বিরিয়ানি মুখে নিয়ে হপ হপ করে বলল, 'খুব ভারী মালপত্র নয়তো বাবু?'

লোকটা উত্তর দেবার আগেই ছোটভাইয়ের প্রশ্ন, 'জিনিসগুলো কী?'

'হালকা, খুব হালকা। বিলিতি ঘড়ি, গাঁজার প্যাকেট, সোনার বিস্কুট—এইসব ছোটখাটো জিনিস আর কী! একেবারে নির্ভাবনায় যাবি-আসবি। তোদের চেহারাটাই এমন যে, তোরা সব সন্দেহের উর্ধে। তাছাড়া তোদের নদীর অভিজ্ঞতাও একটা অ্যাসেট!'

'ইসমাগলিং?'

'স্মাগলিং বললে স্মাগলিং। ব্যবসা বললে ব্যবসা। রেলগাড়িতে, জাহাজে, প্লেনে মাল চালান যায় না? আম, গোলাপ, চা এক দেশ থেকে আর-এক দেশে পাঠানো হয় না? এও তেমনই। শুধু দেখতে হবে কাক-পক্ষী যেন টের না-পায়!'

ছোটভাই তখনও হাতের বিরিয়ানি মুখে নেয়নি, এক ঝটকায় দাদাকে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'খাসনি দাদা, খাসনি। এ অন্ন মুখে তোলবার নয়!'

রঙিন চেয়ারের লোকটা তেমনই বসে থেকেই শান্ত গলায় তার লোকদের বলল, 'এ-দুটোকে আপাতত জাহাজের খোলে চালান করে দে।'

প্রায় অন্ধকার ঘুপচি খোলের মধ্যে বসে দু'-ভাই আর ভয়ে চিৎকার করে কাঁদল না, দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়েও কাঁদল না, দুলে দুলে একে অন্যকে ছড়াও শোনাল না, শুধু চুপ করে বসে আপন মনে ভাবতে লাগল। মা তাদের এত ভালোবাসত, সেই মায়ের কাছে আর যাওয়া যাবে না। বাবা তাদের এত ভালোবাসত, সেই বাবার কাছে আর যাওয়া যাবে না। শেষপর্যন্ত তারা ঠেকল কিনা এসে এই শয়তানদের আস্তানায়!

এই ঘটনার পাঁচদিন পর দু'-ভাই নিজেদের নৌকোয় নিজেদের গ্রাম ছেঁড়াকাঁথায় পৌঁছল। কী করে জাহাজের লোকদের চোখ এড়িয়ে পালাতে পারল, কী করে অচেনা নদী পার হয়ে নিজেদের গ্রাম খুঁজে পেল, কী করেই-বা ওই পাঁচদিন বেঁচে রইল, সে-সব লিখে বোঝাবার শক্তি আমার তো ছাড়, এই পৃথিবীতে কারওই নেই। শুধু একটা কথাই সকলে লেখে যে, বিপদে পড়লে মানুষের শক্তি যে কতদিকে কত বেড়ে যায়, তার কোনও মাপজোক হয় না। তাছাড়া ছেঁড়াকাঁথা গ্রামের সকলেই জলের পোকা। আর এই দুই ভাই তো নৌকো জলে ডুবিয়ে দড়ি বেঁধে দু'জনে মিলে—শুধু নাকটুকু জলের ওপর রেখে—মাইলের পর মাইল নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে পারে!

এদিকে জলজ্যান্ত তিনজন মানুষ—তার মধ্যে আবার দু'জন বেশ ছোট—নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল দেখে, ছেঁড়াকাঁথার সবাই তো হা-হুতাশ করবেই। পাঁচ গ্রাম দূরে থানার নতুন দারোগার

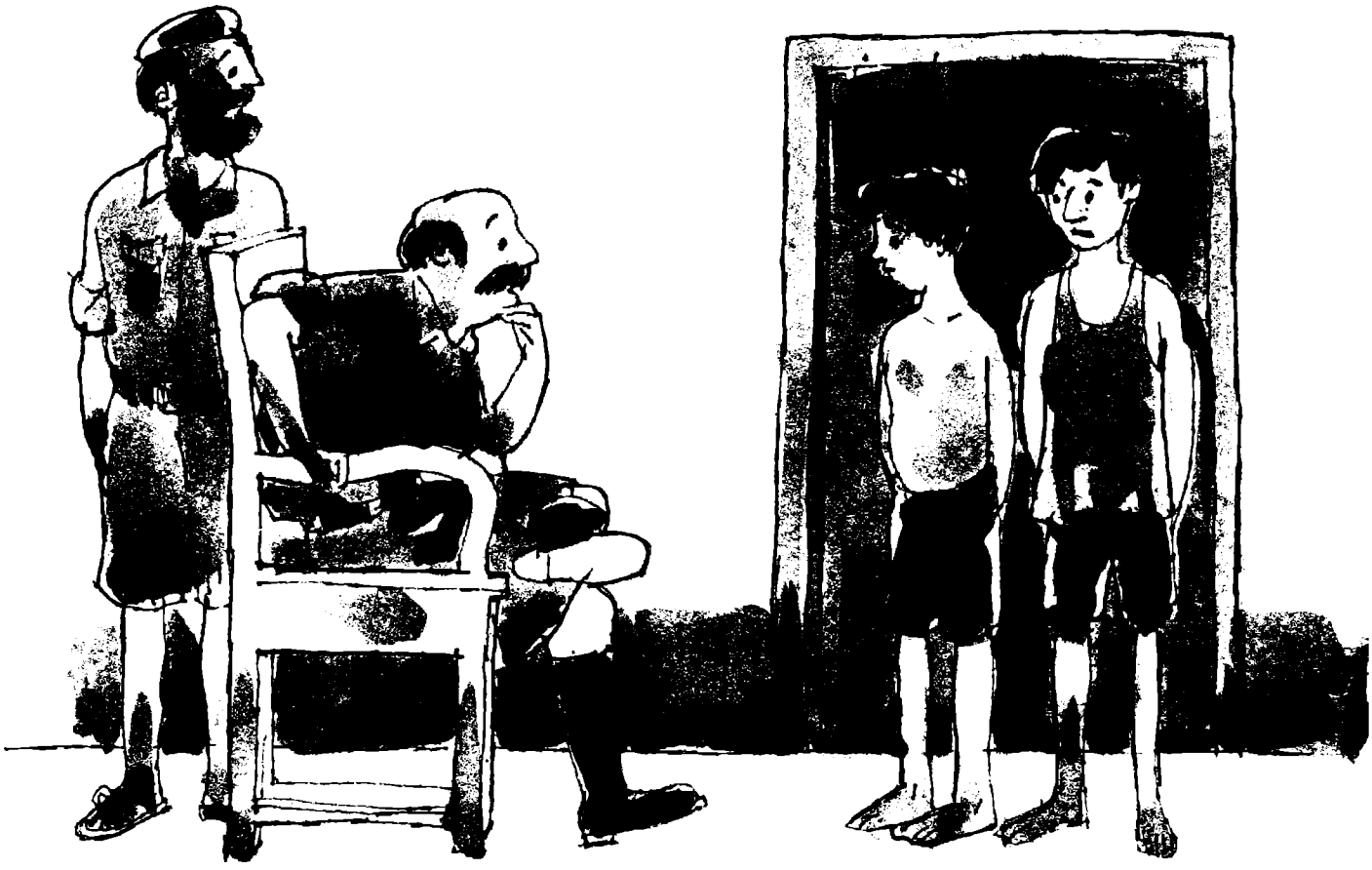

কানেও খবরটা পৌঁছেছিল। ফেরামাত্রই তারা যেন তিনজনই থানায় গিয়ে সশরীরে হাজিরা দেয়—দারোগা নিজে এসে এই নির্দেশও দিয়ে গিয়েছেন।

দু'-ভাই যেদিন গ্রামে পৌঁছয়, তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে। সেদিন পেট ভরে প্রতিবেশীদের দেওয়া পান্তা ভাত নুন-লঙ্কা দিয়ে খেয়ে, সারা রাত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে, পরদিন সকালে দু'-ভাই থানায় দারোগাবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'তিনজনের বদলে মাত্র দু'জন কেন?' বলে প্রথমে খুব হম্বিতম্বি করলেও, তারপর দুই ভাইয়ের মুখে তাদের দুঃখ-দুর্দশার পুরো কাহিনি শুনে, দারোগাবাবু একেবারে থ! তারই মধ্যে একবার 'হুম' শব্দ করে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'বিরিয়ানি-চাঁপ-কাবাব পেয়েও ছেড়ে দেবে আমার এমন দশটা কনস্টেবলও যদি থাকত রে! ছেঁড়াকাঁথা, শালুকফুল, বিন্নিধানপুর—এদিককার এ-রকম দশ-বিশটা গ্রাম আমি ভগবানের দেশ করে দিতাম!'

পরদিনই দু'-ভাইকে দারোগাবাবু নিজে গিয়ে ছেঁড়াকাঁথা গ্রাম থেকে তিন গ্রাম দূরের স্কুলে আবার ভর্তি করে দিলেন। স্কুলের পড়া শেষ হলে তারপর যাতে এই থানাতেই খুদে-পুলিশের পাকা চাকরিও হয়, সে-বিষয়েও তিনি দেশের সরকারকে চিঠি লিখবেন ঘোষণা করে দিলেন। তাঁর মতে, ছোটদেরই পুলিশ হওয়া মানায়। কেননা তাদের মনে সাহস আছে, কিন্তু লোভ নেই। বড়দের ঠিক উল্টো। মন-ভরা লোভ, আর সাহস যেন ভিজে দেশলাই!

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

সুশোভন মান্না

আমাদের সূর্যদেব যে নক্ষত্রমণ্ডল বা নীহারিকার অন্তর্গত, সেই মিল্কি ওয়ে-র ক্ষুদ্রতম নক্ষত্রের সন্ধান সম্প্রতি মিলেছে। আয়তনে সূর্যের প্রায় দশভাগের একভাগ ভরের এই নক্ষত্রের আবিষ্কারক ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির মহাকাশবিজ্ঞানীরা। সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির তুলনায় প্রায় ১৬ শতাংশ বেশি আয়তনের বলে মনে করছেন তাঁরা—যা সৌরমণ্ডলের বাইরের বেশ কিছু গ্রহের তুলনায় ছোট। অথচ সূর্যের থেকে এর ঘনত্ব প্রায় ৫০ গুণ বেশি।

প্রায় আড়াই মিটার লম্বা আইজ্যাক নিউটন অপটিক্যাল 'টেলিস্কোপ'-এ চোখ লাগিয়ে ইংল্যান্ডের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশবিজ্ঞানীরা এই প্রথম কোনও কোনও অন্ধকার নক্ষত্রমণ্ডল বা ডার্ক গ্যালাক্সিকে প্রত্যক্ষ করলেন। যা ভার্গো নামের গ্যালাক্সি-পুঞ্জে আমাদের থেকে কত কিলোমিটার দুরে অবস্থান করছে?

৪৭৫-এর পরে ১৮টা শূন্য বসাও। স্পেনে বসানো ওই টেলিস্কোপ থেকে যে-সমস্ত ছবি পাওয়া গেছে, তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন—কৃষ্ণনক্ষত্রমণ্ডল আসলে উজ্জ্বলতাবিহীন ঘূর্ণনরত বস্তুপিণ্ড বিশেষ—যা বিশেষজ্ঞদের হিসেবের তুলনায় প্রায় হাজার গুণ বড়। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ভিরগোহিকী ২১'—কী বিদঘুটে না?

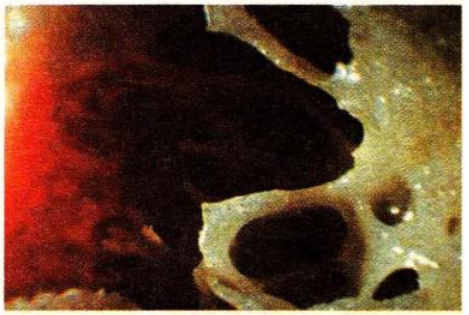

নাকি এরিমাইনোসেরাস নামের প্রাচীনতম বিলুপ্ত সামুদ্রিক প্রাণীরা ভারতের গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলে বাস করত। কলকাতার ভূতত্ত্ববিদ শুভেন্দু বর্ধন ও তাঁর ছাত্ররা সম্প্রতি 'জার্নাল অব এশিয়ান আর্থ সায়েন্সেস্'-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় এই তথ্য দিয়েছেন। আজকের শামুকদের কোনও এক দূরবর্তী আত্মীয় হল এই প্রজাতি। প্রায় ১৬ কোটি বছর আগে এদের উৎপত্তি, তারপর ধীরে ধীরে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে বসতি বিস্তার। এটাও প্রায় ১০ থেকে ২০ লক্ষ বছর আগের ব্যাপার!

ঘড়ঘড় বা টুং-টাং বা দুড়ুম—শব্দ যেমনই হোক, আমরা ঠিক তেমনই শুনি কী করে? মনে হতে পারে, 'জীবনবিজ্ঞান' বইয়ের পাতায় তো অন্তঃকর্ণের গঠন ও তিনটে তরুণাস্থি হয়ে শব্দের প্রসার কীভাবে হয়, তা তো পড়েইছি। তবে? তরুণাস্থিত্রয়—ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস—যেভাবে বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন কম্পাঙ্কে কেঁপে ওঠে, তার

সঠিক সংকেত মস্তিষ্ক কীভাবে পায়—অ্যাদ্দিন এটাই ছিল রহস্য। সমাধান করেছেন ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। ওঁরা বোঝাতে পেরেছেন : সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চুলের মতো অসংখ্য সংজ্ঞাবাহী কোষ কীভাবে অন্তঃকর্ণের ধাত্রে অবস্থানরত অবস্থায় এক-একরকম শব্দে প্রয়োজন মতো কম-বেশি যান্ত্রিক বল প্রয়োগ করে। 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত এই গবেষণাপত্রটা পড়ে আরও জানা গেছে—ওই বিবিধ বল কেমন করে চুলের নার্ভকোষের ডগায় থাকা ততোধিক সূক্ষ্ম চ্যানেলগুলোকে উদ্দীপ্ত করে এবং শব্দানুভূতি জোগায়। ওই চ্যানেলগুলোতে বিবিধমাত্রার উপযুক্ত বলই আসলে প্রতিটা শব্দকে আলাদা করে ভাবতে শেখায়। অবশ্য এ-সমস্ত ঘটনা এক মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে থাকে।

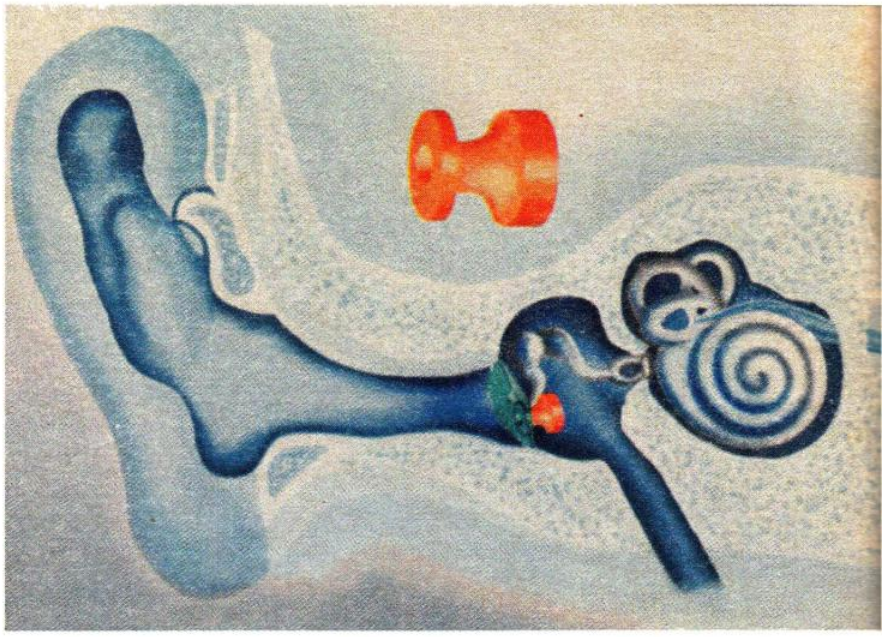

নামাঙ্কন : সমীর দাশ

আরে বাবা, উইপোকা বলে কি তাদের কোনও পছন্দ-অপছন্দ নেই? 'ভীষণভাবেই আছে'—এই অভিমত অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অর্গানাইজেশন-এর বিজ্ঞানীদের। ক্রিপটোটারমিস ডোমেস্টিকাস্ নামের এক ধরনের উইপোকার কার্যকলাপ খুঁটিয়ে দেখে তাঁরা জানাচ্ছেন যে, এরা যে-কোনও মাটি দেখলেই গর্ত খুঁড়ে বাসা বানানো শুরু করে না। 'প্রসিডিংস অব্ দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব্ সায়েন্স' নামের জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় বলা হয়েছে—উইপোকারা কোনও কাঠকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার আগে এই কাঠের প্রকৃতি যাচাই করে নেয়। কীভাবে? কাঠের মধ্যে কোনও শব্দের কাঁপুনির ধরন দেখে। শব্দটা যে ওরা নিজেরাই করে থাকে, তা বোধহয় আমরা জানি।

বৃশ্চিক ধারাবাহিক

স্তব্ধ হৃদয়

ইন্দ্রনীল ঘোষ

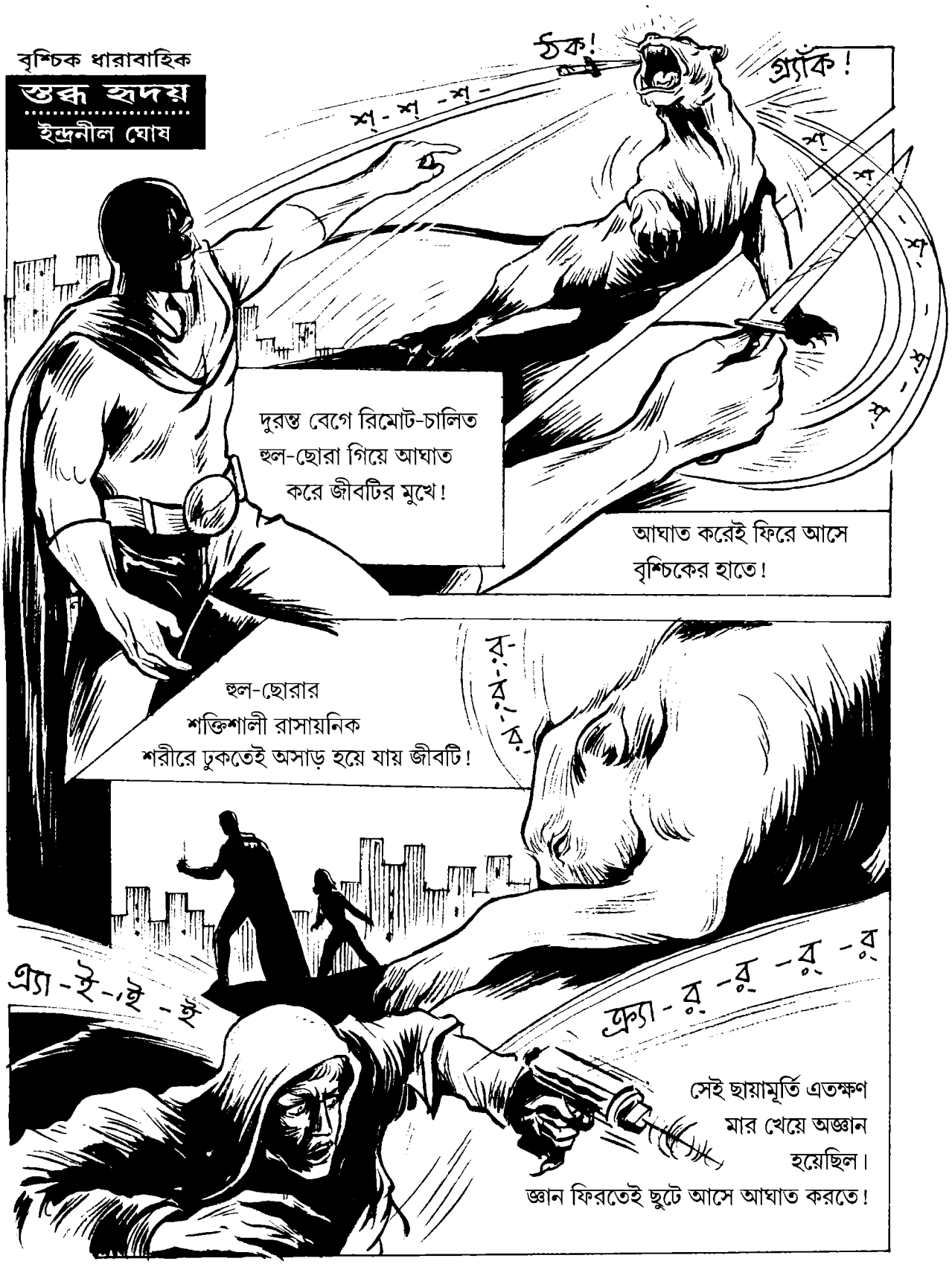

চেনা চেনা ঠেকছে!
আঁক্!
আবার এক ভয়ঙ্কর আঘাতে ছিটকে পড়ে সে!
ধুপ্!
একজনকে তো আঁচ করতে পেরেছি। কিন্তু অন্যজন?!
পড়ে-থাকা দুই জীবের দিকে এগোয় বৃশ্চিক। ঠিক সেই মুহূর্তে বৃশ্চিক আর রীমার মধ্যে এসে দাঁড়ায় একটা ভ্যান!
ক্যা-চ্-চ্!
টাট্-টাট্-টাট্!
আড়াল নাও!
ভ্যান থেকে নেমে আসে দু'জন আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রধারী শ্বেতাঙ্গ মানুষ! অচেতন দুই জীবকে আড়াল করে তারা বুলেটবর্ষণ করতে থাকে বৃশ্চিকের দিকে!

পিয়ের গ্রিপারি

মুফতার রোডের ডাইনি

মূল ফরাসি থেকে ভাষান্তর : শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

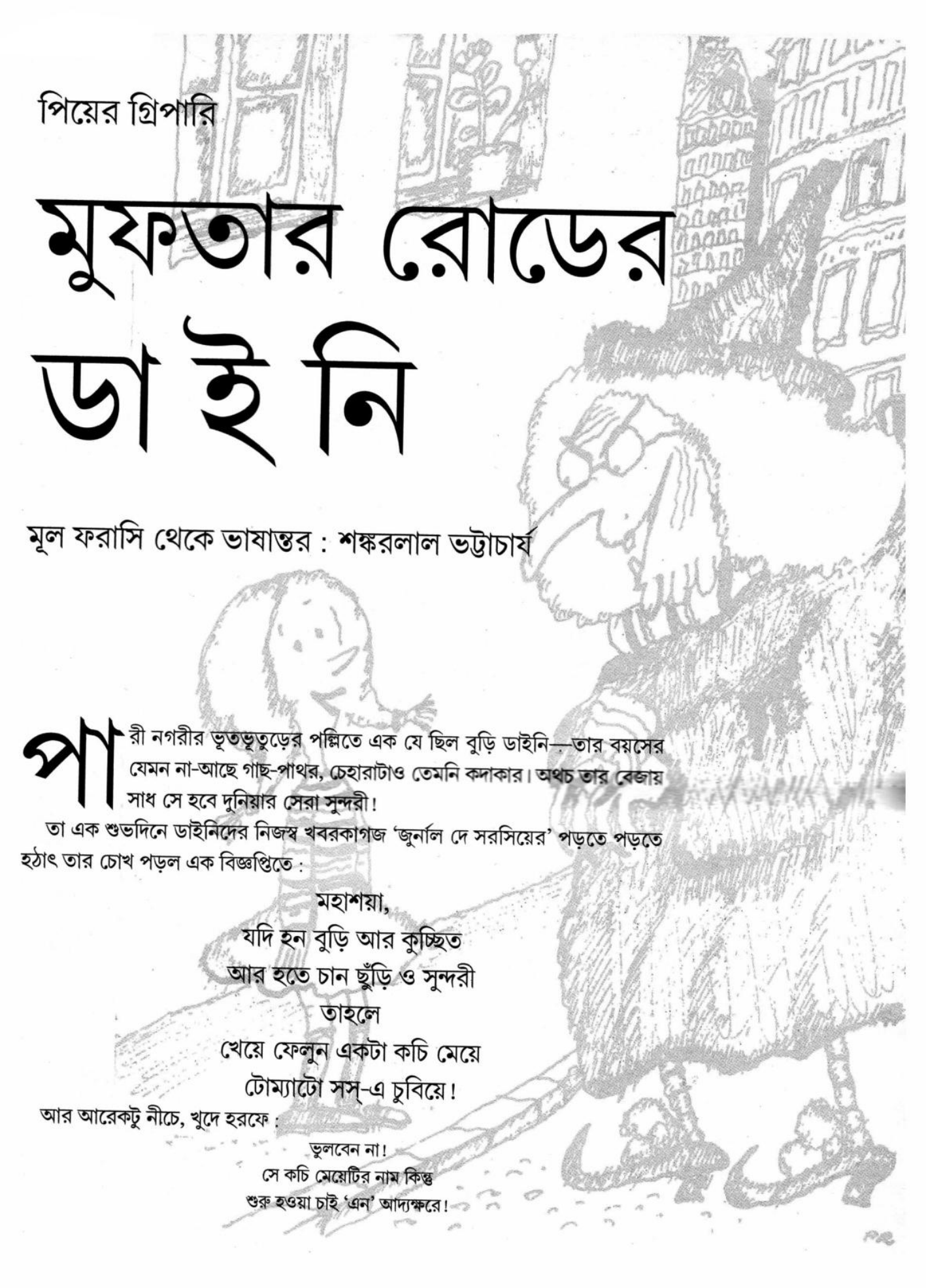

পারী নগরীর ভূতভুতুড়ের পল্লিতে এক যে ছিল বুড়ি ডাইনি—তার বয়সের যেমন না-আছে গাছ-পাথর, চেহারাটাও তেমনি কদাকার। অথচ তার বেজায় সাধ সে হবে দুনিয়ার সেরা সুন্দরী!

তা এক শুভদিনে ডাইনিদের নিজস্ব খবরকাগজ 'জুর্নাল দে সরসিয়ের' পড়তে পড়তে হঠাৎ তার চোখ পড়ল এক বিজ্ঞপ্তিতে :

মহাশয়া,
যদি হন বুড়ি আর কুচ্ছিত
আর হতে চান ছুঁড়ি ও সুন্দরী
তাহলে
খেয়ে ফেলুন একটা কচি মেয়ে
টোম্যাটো সস্-এ চুবিয়ে!

আর আরেকটু নীচে, খুদে হরফে :

ভুলবেন না!
সে কচি মেয়েটির নাম কিন্তু
শুরু হওয়া চাই 'এন' আদ্যক্ষরে!

এখন সেই পল্লিতেই বাস ছিল এক বাচ্চা মেয়ের, নাম নাদিয়া। সে ছিল বুড়া সঈদের বড় মেয়ে। জানি না, সঈদ বুড়ার সঙ্গে তোমাদের আবার পরিচয় আছে কিনা! বুড়া সঈদ মুদির দোকান চালায় ব্রোকা সরণিতে।

'তাহলে তো নাদিয়াকে খেয়ে ফেললেই হয়—' আপন মনে বলে বসল ডাইনি।

তো একদিন যখন রুটি কিনবে বলে রাস্তায় বেরিয়েছে নাদিয়া, এক বৃদ্ধা বিলকুল তার মুখের সামনে হাজির : 'শুভদিন, আমার ছোট্ট নাদিয়া!'

'শুভদিন, মহাশয়া!'

'একটা ছোট্ট কাজ করে দিবি লক্ষ্মীটি?'

'কী কাজ?'

'তোর বাপের দোকানেই তো যাচ্ছিলুম এক বোতল টমেটো সস্ কিনব বলে। তা এমন কেলান্ত হয়ে পড়েচি যে আর গিয়ে উঠতে পাচ্চিনে।'

নাদিয়ার মনটা বড় নরম, সে তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি। আর সে সস্ জোগাড়ে দৌড় দিতেই ডাইনি একগাল হেসে, খুশিতে হাত মটকাতে মটকাতে আপন মনে বললে, 'হায় রে! কী প্যাঁচই-না কষেছি! খুকি নিজেই সস্ বয়ে আনচে, যা দিয়ে ও নিজেই এই পেটে চালান হয়ে যাবে।'

রুটি কেনা হতে বাপের দোকনে গিয়ে তাক থেকে এক বোতল টমেটো সস্ নামিয়ে দাম কষবার জন্য দিল বাবাকে। সস্ নিয়ে বেরুচ্চে, হঠাৎ বাবা বললে, 'হ্যাঁ রে, কই যাস তুই হনহনিয়ে?'

'এই সসের বোতল দিতে যাচ্চি এক বুড়িকে। সে কিনে নে যেতে বলেচে।'

'তুই রোস্ এখেনে—' ধম্‌কে বললে বুড়া সঈদ, 'তোর ওই বুড়ির যদি এতই কিছু দরকার, তো সে নিজে এলে না কেন!'

নাদিয়া বড় বাধ্য মেয়েও তো, সে চুপটি করেই রইল।

কিন্তু পরদিন কী হল, সেই পথ দিয়ে যেতে গিয়ে ফের পড়লে সে বুড়ির সামনে : 'কী রে, কেমন আচিস, নাদিয়া? আর আমার টমেটো সস্?'

'আমায় মাফ করবেন, বুড়িমা।' বলতে বলতে লজ্জায় মুখটা রাঙিয়ে গেল নাদিয়ার, 'বাবা না, চাইছিল না আমি অন্যের ফরমাশ খাটি। বলল আপনিই তো আসতে পারেন।'

'কী আর করার? তা'লে তাই যাই।' বললে বুড়ি।

সেদিনই মুদির দোকানে ঢুকল বুড়ি।

'শুভদিন, সইয়দ মশায় গো!'

'শুভদিন, মহাশয়া। কী চান?'

'আমার চাই নাদিয়া।'

'অ্যাঁ?!'

'ওহো, মাফ করবেন, কী যে ছাইপাঁশ কয়ে ফেলি! বলতে চাচ্চিলুম—এক শিশি টমাটো সস্।'

'তাই বলেন! তা বড় শিশি , না ছোট?'

'বড়ই তো চাই, নাদিয়াকে... হলে?'

'কীীীী???'

'ও না না না! আরে বলতে তো চাচ্ছিলুম—স্প্যাগেটি খাওয়ার মতন চাই।'

'তাই কন। ভালো রে ভালো, আমার এখেনে স্প্যাগেটিও পাইবেন।'

'না-না, তার দরকার নেই, আমার তো নাদিয়াই আচে...'

'সে কী!'

'মাফ করেন, বলার ইচ্চে ছিল—স্প্যাগেটি তো ঘরেই মজুদ...'

'তা'লে... এই নেন বোতল।'

বুড়ি বোতলটা নিল, দাম মেটাল। তারপর বেরুবার মুখে বোতলটা খানিক নেড়ে বললে, 'হুম্! এ যে দেখি একটু ভারীই... একটু দেখেন যদি...'

'কী?'

'নাদিয়াকে একটু পাঠাতে পারেন আমার ওখেনে?'

বুড়া সঈদের বেশ সন্দেহ হল।

'না সায়েবানি, আমরা কারও ডেরায় জিনিস পৌঁছাই না। আর নাদিয়ার তো অন্য কাজ আছে। যদি বোতল এত ভারীই ঠেকে, তাহলে ওটা রেখেই দেন, কী করার!'

'না, নিয়েই যাই।' বললে ডাইনি, 'আচ্ছা আসি, সইয়দ মশায়।'

'হ্যাঁ, আসেন, সায়েবানি।'

এভাবে ডাইনি তো সসের বোতল নিয়ে রওনা দিল। আর নিজের ডেরায় ফিরে আপন মনে কথা শুরু করলে, 'একটা কল করব ভাবচি। কাল সক্কালে মুফতার রোড যাব। সাজ ধরব দোকানির। আর পথ দিয়ে নাদিয়া যখন যাবে বাড়ির ফরমাশ খাটতে, আমি খপ্ করে গে ধরব ওকে।'

পরদিন মাংসের দোকানি সেজে মুফতার রোডে বসেছিল ডাইনি, যখন সে-পথ দিয়েই এগুচ্ছিল নাদিয়া।

'কী খবর, ছোট্ট খুকি? মাংস নিবি নে?'

'না মহাশয়া, আমার চাই মুর্গি।'

'ধ্যাত্তেরিকা।' মনে মনে চেল্লাল ডাইনি।

পরদিন মুর্গির মাংসের দোকানি সেজে বসল ডাইনি।

'সুপ্রভাত, কচি খুকিটি! মুর্গি নিবি তো?'

'ও হো! না, মহাশয়া। আজ তো আমার মাংস চাই।'

'আরে, দূর্ ছাই!' মনে মনে বলল ডাইনি।

তার পরেরদিন ফের এক নতুন চেহারা ধরে ডাইনি একইসঙ্গে বেচতে বসল মুর্গি আর মাংস।

'কেমন আছিস রে আমার ছোট্ট সোনা নাদিয়া? কী চাস খুকি আজ? যা চাইবি, সব রেকেচি আজ এই অ্যাত্তো সাজিয়ে। গরু চাস গরু, ভেড়া তো ভেড়া, মুর্গি চাইলে মুর্গি, নইলে খরগোশ—'

'ঠিকই। কিন্তু আমি যে কিনতে এয়েচি মাছ।'

'ফুউউউস্!'

বাড়ি ফিরে ডাইনি ভাবতে বসল, আর ভেবেই চলল, ভেবেই চলল...
শেষে এক জব্বর ফন্দি কষল মগজে।

'এই তো চক্কোর, বাছা। কাল সক্কালে আমি হব মুফতার রোডের সব দোকানি—বিলকুল সব! যার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে, সে-ই আমি! আমিই সব! মুফতারের সব দোকানিই আমি!'

ফলে পরেরদিন মুফতার রোডের সব দোকানিই হল বুড়ি ডাইনি—নানা বেশে, নানা চেহারায়, ভিন্ন ভিন্ন পসার সাজিয়ে। হিসেব করে বলতে গেলে ২৬৭! না কম, না বেশি।

অন্য দিনের মতো নাদিয়াও এসে পড়ল। এসে পড়ে ভালো মনে আনাজপাতির ঝুড়িগুলোর দিকে পা বাড়াল, কিছু শিম কিনবে বলে। তারপর যেই দাম মেটাতে দোকানির কাছে গেল, সে খপ্ করে ওর কব্জি ধরে এক টানে ওকে নিয়ে ফেলল ক্যাশবাক্সের মধ্যে। আর দড়াম্ করে সেটা সেঁটেও দিলে তৎক্ষণাৎ।

কপালগুণে নাদিয়ার একটা ছোট্ট ভাইও ছিল, নাম যার বশির। দিদি আসে না, আসে না দেখে সে মনে মনে বলল, 'আলবৎ ওই ডাইনিই পাকড়েছে ওকে। তা'লে তো ওকে ছাড়াতে হয় এখন।'

তখন ওর গিটারটা বাগিয়ে মুফতারের রাস্তায় নেমে পড়ল বশির। আর ওকে আসতে দেখে বাজারের ২৬৭ দোকানি (যারা সবাই আসলে ওই ডাইনি) ওকে উদ্দেশ করে চেঁচাতে লাগল : 'এইভাবে কই যাও, বশির?'

বশির চোখ বুজে জবাব দিল, 'আমি এক গরিব, অন্ধ গানঅলা। দু'টি পয়সার জন্য একটুকুন এক গান ধরব এখন।'

'কী গান গাইবা?' সমস্বরে জিজ্ঞেস করল সব দোকানি।

'আমার ইচ্ছে যে-গানটা ধরা, তা হল : 'নাদিয়া, কোথা তুই?...'

'না, ওইটা চলবে না। অন্য কিছু গা। আর বেশি গলা চড়াবি নে।'

'ঠিকাছে। ঠিকাছে। খুব আস্তে করে গাইব।'

আর এই বলে একদম সপ্তমে গান ধরল বশির :

'নাদিয়া, কই গেলি তুই?
আছস কই?
তোর আওয়াজ লিগ্যে
কান পাতি রই।
কই গেলি তুই?
আছস কই, নাদিয়া?
দিস্নে দেখা, এই বশির মরে কাঁদিয়া।'

'আরে নামা। নামা। গলা নামা।' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ২৬৭ দোকানি, 'তুই যে কালা করে ছাড়বি দেখছি সক্কলকে!'

কিন্তু বশির গেয়েই চলে :

'নাদিয়া, কই গেলি তুই?
আছস কই?'

আর ঠিক তক্ষুনি এক পিনপিনে গলায় কোত্থেকে যেন উত্তর এলো ওর :

'ভাইটি বশির, জলদি আয়
ডাইনির হাতে প্রাণটা যায়।'

এই শোনামাত্র চোখ মেলে দিল বশির আর 'দ্যাখ্-না-দ্যাখ্ হেঁই-হেঁই' করে তার দিকে তেড়ে গেল ২৬৭ দোকানি। তারা সবাই চেঁচাচ্ছে : 'ব্যাটা অন্ধ না ঘেঁচু। ব্যাটা ভণ্ড।'

কিন্তু ডরাবার পাত্র নয় বশির, সে হাতের ছোট্ট গিটারটা দিয়ে বেদম বাড়ি লাগাল সবচাইতে নিকটের দোকানিটার মাথায়। বাড়ি খেয়ে ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে কাঠ হয়ে রইল দোকানি। আর সঙ্গে সঙ্গে বাকি ২৬৬ দোকানিরও একই দশা। পড়ছে আর থম্‌কে রইছে। ওরা লোক তো একজনই, একজন বাড়ি খেতে সব্বাই বাড়ি খেয়ে কুপোকাত।

তখন বশির একটার পর একটা দোকানে ঢোকে আর গেয়ে যায় :

'নাদিয়া, কই গেলি তুই?
আছস কই?'

এরকম দু'বার গাইতেই সরু গলায় জবাব এলো :

'বশির, বশির, বাঁচা আমায়
ডাইনির হাতে প্রাণটা যায়।'

এইটা শুনে বশিরের আর সন্দেহ রইল না—আওয়াজ আসছে আনাজপাতির দোকান থেকে। ও দোকানটার শো-কেসের ওপর চড়ে লাফ মেরে ভেতরে গিয়ে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে সেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা দোকানিরও সম্বিৎ ফিরল, সে একটা চোখ মেলে চাইল। তক্ষুনি আবার বাকি ২৬৬ দোকানিরও জ্ঞান ফিরল আর ২৬৬টা চক্ষুও উন্মীলিত হল। বরাতজোরে বশির সেটা নজরও করল, আর সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষম এক ঘায়ে ফের তাদের কিছুক্ষণের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিল।

এরপর ক্যাশবাক্সটা খোলার উদ্যোগ করল, আর তাতে নাদিয়ার কেওনও জারি হল :

'বাঁচা রে বশির, বাঁচা রে ভাই
(নইলে) ডাইনির খপ্‌রে মইর‍্যা যাই!'

কিন্তু ক্যাশবাক্স এত আঁট, সে খোলে কার সাধ্যি!

নাদিয়া গেয়ে চলে, বশিরও বাক্স খুলতে নাস্তানাবুদ হতেই থাকে। আর ইত্যবসরে ওই ২৬৭ দোকানি চোখ খোলে ফের। কিন্তু এবার টনক নড়তেও ওরা চোখের পাতা আর ফাঁক করে না! তবে বেবাক পড়ে না-থেকে ওরা গুটি গুটি এগোয় হামা দিয়ে, যেখানে বশির বাক্স খোলায় ব্যস্ত। তারপর একসময় ২৬৭ দোকানির বেশে ডাইনি ওকে ঘিরে ধরে!

কর্মক্লান্ত বশির আর ভেবে পাচ্ছিল না কী করে। হঠাৎ দেখল রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে লম্বা-চওড়া, উর্দিটুর্দিতে ফিটফাট তরুণ নাবিক এক।

'শুভদিন, নাবিক। একটু সাহায্য করবে, দাদা?'

'কীরকম?'

'ক্যাশবাক্সটা আমাদের বাড়ি বয়ে নিয়ে যাবে? আমার দিদি এতে আটকে পড়ে আছে।'

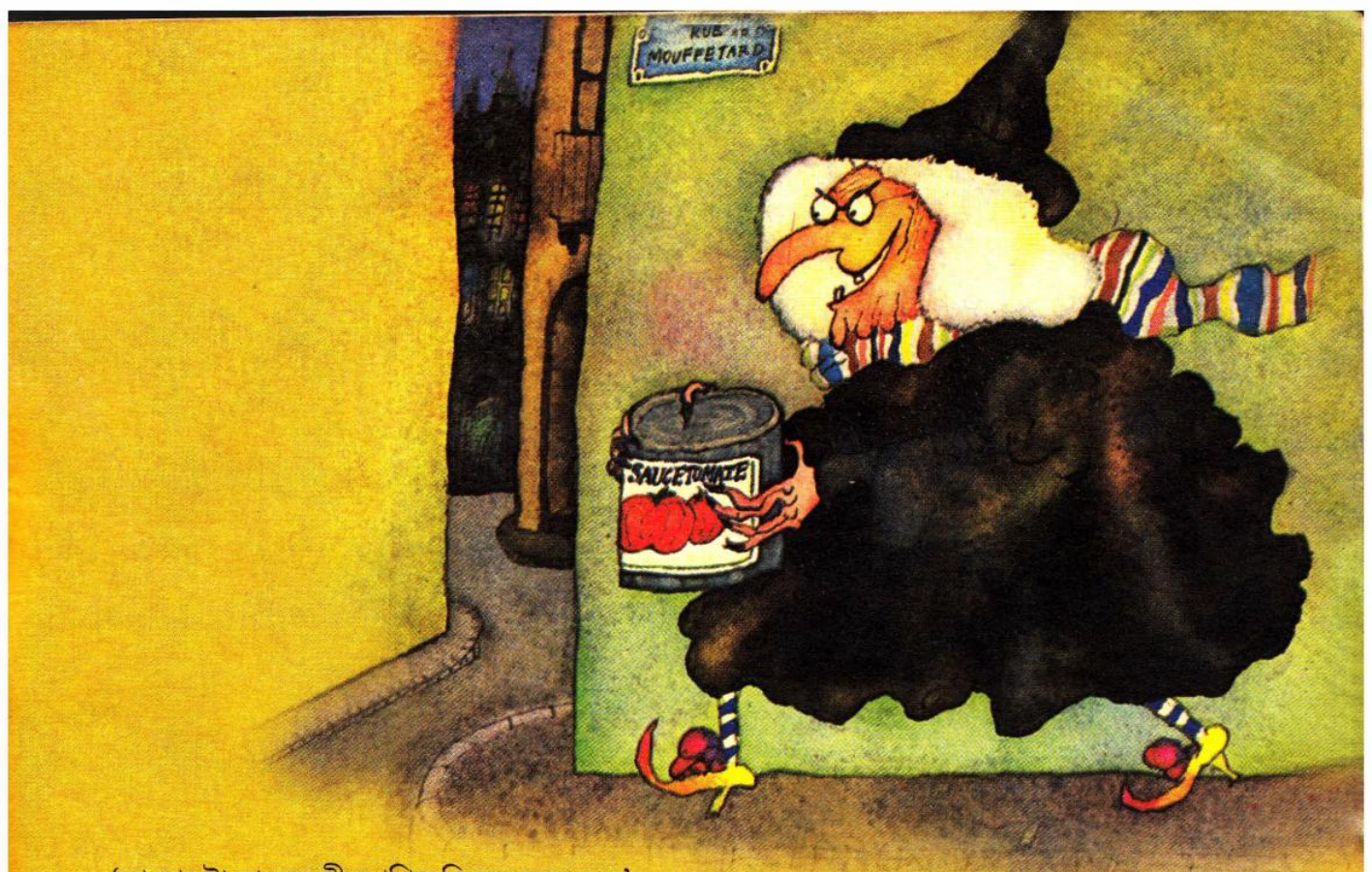

'তা কাজটা সারলে কী বখশিস মিলবে অধমের?'

'বাক্সের পয়সাকড়ি তুমি পাবে, আর দিদিটাকে পাব আমি।'

'রাজি!'

বশির ক্যাশবাক্সটা তুলে নাবিকের হাতে জমা দিতে গেল, ততক্ষণে আনাজের দোকানদার কাউকে কিছুটি বুঝতে না-দিয়ে নিস্তব্ধে এসে ওর একটা পা পেঁচিয়ে ধরে ফেলেছে। আর রিনরিনে গলায় চিল্লিয়ে উঠল, 'তবে রে শয়তান, এবার তোকে খুনই করব।'

বশির এত নড়ে গেল ওই ঝটকায় যে হাত থেকে ক্যাশবাক্সটা ছিটকে পড়ল। আর ওই ইয়াভ্ভারী বাক্স পড়বি তো পড় একেবারে দোকানির মাথার ওপরে। ফলে যা হবার তাই হল, মাথা ফেটে চৌচির। তাতে সব ২৬৭ দোকানিই একসঙ্গে মারা পড়ল। মাথার ঘিলুফিলু ফেটে বেরিয়ে সে-এক কাণ্ড! আর এইবার ডাইনি সত্যি সত্যি মরল বটে, যাকে বলে যথার্থ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি।

এতেই ইতি নয়। পতনের ওই ধাক্কায় ক্যাশবাক্সও হাট হয়ে খুলে পড়ল। আর লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো নাদিয়া।

আর বেরিয়েই জড়িয়ে ধরে চুমু দিল ভাইটিকে, হাজারটা ধন্যবাদ দিল, তারপর দু'জনায় মিলে ফিরে গেল মা-বাবার কাছে।

আর এই যখন চলছে একদিকে, তখন অন্যদিকে, ডাইনির তিল তিল করে জমানো গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা দিব্যি গুছিয়ে ঝোলায় ভর্তি করতে লাগল নাবিক।

অলঙ্করণ : পুইগ রোসাদো

শালিকবাড়ির খুকু

রত্নেশ্বর হাজরা

অলঙ্করণ : নীতীশ মুখোপাধ্যায়

ও শালিক, ও ছোট্ট শালিক—গাঙশালিকের ছাও
ও শালিক, ও ছোট্ট শালিক, আমার দিকে চাও।
তোমায় দেব জামবাটিতে মুড়ির ছাতু, খই—
এক্কা-দোক্কার উঠোন দেব—বিকেলে হইচই।
ও শালিক, ও ছোট্ট শালিক—গাঙশালিকের ছাও
কদমপাতায় বানিয়ে দেব বাতাস-তোলা নাও।

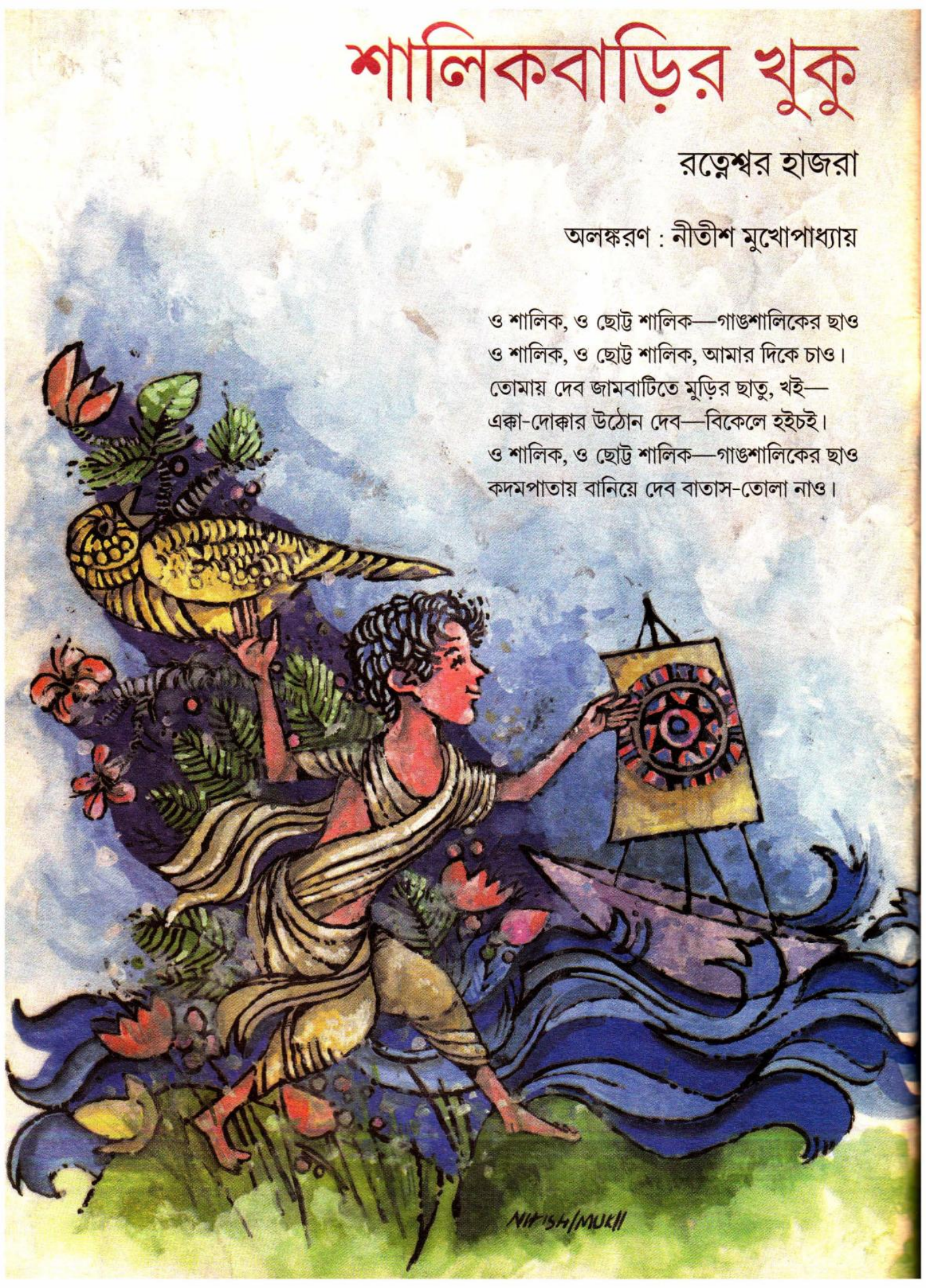

ডাকব যখন ঠিক তখুনি আমার কাছে যদি
একটু আসো—তোমায় দেব চর-জাগানো নদী,
খেলতে পাবে বালির চরে সেই নদীটার কূলে
দেখবে হাওয়া কাটছে বিলি ঢেউয়ের এলোচুলে।
ও শালিক, ও ছোট্ট শালিক—গাঙশালিকের ছা
তোমার সাথে হাঁটব আমি হাঁটি হাঁটি পা।

বাড়ির পিছে বাগান দেব—খিড়কি পুকুর ঘাট,
বাগান থেকে ঘরে আসবে ডিঙিয়ে চৌকাঠ।
আমার মতোই খাবার পাবে—অল্প এতটুকু
ও শালিক, ও ছোট্ট শালিক—শালিকবাড়ির খুকু,
দু'জন মিলে রাতেরবেলা জোছনা করব চুরি
দেখবে শুধু চাঁদের দিদা—আদ্যিকালের বুড়ি।

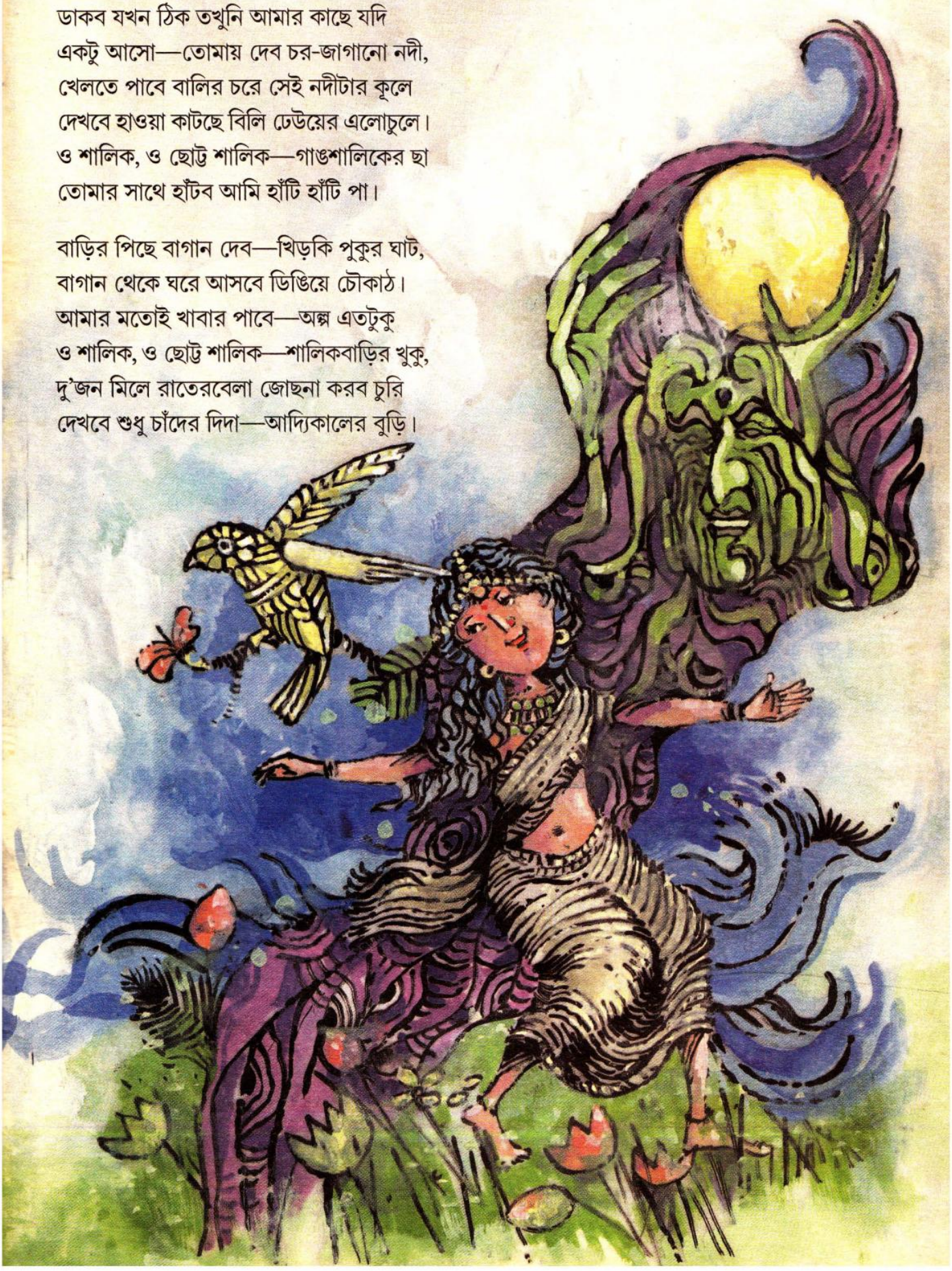

রান্না বান্না

রাজশ্রী রাহা

রিম্পির এখন গরমের ছুটি। সকালে উঠে ওদের ছোট্ট বাগানে একটা প্রজাপতির সঙ্গে খানিক ছোটাছুটি করল। তারপর ওর ছোট্ট পুতুলদের সুন্দর সুন্দর ফ্রকগুলো বদলে ফেলল। বেসিনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট ছোট্ট হাত দিয়ে যখন জামাগুলো ধুচ্ছে, মা-র কাছে খেল একটা ছোট্ট বকুনি।

মা-র দু'-চোখে তখন হাসি। রিম্পির হাতে মা ধরিয়ে দিলেন লম্বা লম্বা সরু-সরু করে কাটা একবাটি কাঁচা আম। বাটি তো নয়, জামবাটি।

রিম্পি অবাক! কী করব এত আম নিয়ে?

'তুমি এটা দিয়ে আঁচার বানাবে।'

বিস্ময় আর হাসিতে ঝলমল করে উঠল রিম্পির মুখ।

'যাও। খাতা-কলম নিয়ে এসো। লিখে নাও কী কী লাগবে।'

মা-র কথা-মতো রিম্পি লিখতে লাগল।

(১) বড় বড় দুটো কাঁচা আম, খোসা ছাড়িয়ে সরু সরু লম্বা লম্বা করে কাটো। যেমন করে আমি কেটেছি।

(২) প্রায় এক চা-চামচ নুন।

(৩) চার চামচ চিনি।

(৪) দুটো ঝাল ঝাল লম্বা কাঁচা লঙ্কা। কুঁচিয়ে নাও।

(৫) সরষের তেল এক চামচ।

রিম্পি সব ক'টা জিনিস জোগাড় করে, খুব যত্ন করে আমের বাটিতে ঢালল। এবার একটা বড় চামচ ভালো করে ধুয়ে-মুছে শুকনো করে রিম্পির হাতে দিলেন মা।

'নাও। চামচ দিয়ে যত্ন করে মাখো। সব ক'টা আমে সবকিছু যেন ভালো করে মাখা হয়।'

রিম্পি মহা আনন্দে চামচ দিয়ে নেড়েচেড়ে মেশাতে লাগল। একবার খালি বলল, 'মা, হাত দিয়ে মেশাব?'

আলতো জড়িয়ে ধরে রিম্পিকে আদর করে মা বললেন, 'তাহলে যে লঙ্কার ঝালে আমার সোনামণির হাত জ্বালা করবে!'

রিম্পি আবার মন দিয়ে মেশাতে লাগল। মায়ের আদরে রিম্পির বুকের ভেতরে গুড়গুড় করে উঠল।

খানিক বাদে রিম্পি বলল, 'মা, এবার?'

একটা পরিস্কার সাদা পাতলা কাপড় রিম্পিকে দিয়ে মা বললেন, 'চলো, এবার রোদে দেবো। দেখিস, ভালো করে কাপড় দিয়ে ঢাকা দিবি। না-হলে ধুলো পড়তে পারে।'

ব্যালকনির রোদে কাপড়ে-ঢাকা কাঁচা আম-মাখা। পাশের ছায়াতে রিম্পি বসে রইল। রোদ সরে যায়। রিম্পিও জামবাটি সরিয়ে নিয়ে যায়। দু'-ঘণ্টা বয়ে যাবার পর মা এলেন। এসেই করলেন কী—নরম-হয়ে-আসা আমগুলোকে হাত দিয়ে ভালো করে চট্‌কে দিতে লাগলেন।

রিম্পি চোখ বড় বড় করে বলে উঠল, 'মা, তোমার হাত জ্বালা করবে না?'

মা বাঁ-হাতে রিম্পির চুলটা একটু নেড়ে দিয়ে বললেন, 'আমি তো মা!'

নামাঙ্কন : সৌমিত্র সোম

অলঙ্করণ : সমীর সরকার

R N I No 12007/64

SANDESH • JUNE 2005
a bengali monthly
for young readers

Rs 10.00

রেঁধে আরাম!

একশ-শতাংশ নিরাপদ, পুরোপুরি
বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রোটিন ও
ভিটামিনের গুনে ভরপুর

arambagh's chicken

SQF 2000
HACCP
QUALITY ASSURED